সপ্তক

উৎসর্গ

শ্রীমতী প্রীতি বসু

কল্যাণীয়াসু—

সপ্তক

শ্রীসরযূলাল বসু

সূচীপত্র

ছাড়াছাড়ি

আমার টর্চটা নিলে কে এখান থেকে? ও অরু, ও খোকা!

পাশের ঘর থেকে শেফালী উত্তর করলে, আমি রেখেছি, আজ আর বেরিয়ে কাজ নেই।

কেন বল তো?

শরীরটার দিকে দেখতে হবে তো।

ব্যস্ত হয়ে রামেন্দু বললে, না বেরুলেই চলবে না। আজ একটা কম্‌পিটিশনের খেলা আছে।

তা থাক, ও তোমাদের নিত্যিই আছে। এই খারাপ শরীর নিয়ে আজ যেতে হবে না।

শরীর এমন কিছু খারাপ হয় নি, দাও না টর্চটা।

না বলছি না? আজ যেতে পাবে না। এক আধ দিন না গেলে কি হয়?

বড় মুস্কিলে ফেললে তো! আমি যে আপিসে ব'লে এসেছি ঠিক সাতটায় হাজির হব। দাও না, লক্ষ্মীটি।

কেন ব'লে এলে? বেশ একটু সর্দ্দির ভাব হয়েছে। ভাল ক'রে স্নান কর নি আজ, আমি দেখি নি? এই কার্ত্তিক মাসের ঠাণ্ডা, সেই রাত এগারোটায় ফিরবে,—সে কিছুতেই হবে না।

রামেন্দু অধীর হয়ে বলে, ওগো না, কিছু হবে না ওতে। সবাই কি মনে করবে বল তো?

সবাই তো মনে ক'রেই খালাস, আমার তো তা নয়। তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আজ আর বেরিও না। আমি তো জানি তোমার শরীর।

কি বিপদ! আজ না হয় সকাল সকাল চ'লে আসব।

নিরুপায় হয়ে শেফালী বললে, না, এমন ক'রে কি পারা যায়! এস গে তবে, কিন্তু ঠিক সাড়ে আটটার সময়ে না এলে ভাল হবে না ব'লে রাখছি।

সোৎসাহে রামেন্দু বললে, আচ্ছা, তাই হবে। এতক্ষণে ছাড়পত্র মঞ্জুর হ'ল। হরু পণ্ডিতের পাঠশালাতেও এমন শাসনে পড়ি নি। এগিয়ে গিয়ে শেফালীর মুখখানি তুলে ধ'রে রামেন্দু বললে, তবে এখন—

অরু ও খোকা তাকিয়ে ছিল। শেফালী চট ক'রে তার সম্মতির নিদর্শন জানিয়ে মুখখানা সরিয়ে নিয়ে বললে, যাও, ভারি বেয়াড়া তুমি। মনে থাকে যেন—সাড়ে আটটা। শেফালীর এই প্রাপ্যটুকু না দিয়ে রামেন্দুর কোথাও এক পা বাড়াবার উপায় ছিল না।

টর্চটা হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়বার উদ্যোগ করতেই শেফালী বললে, দেখ বাহাদুরিটা, ওই পাতলা পাঞ্জাবিটা গায়ে দিয়ে বেরুবে নাকি! থাম, জামাটা বদলে দিই।

রামেন্দুকে মায় ঘর-সংসার শেফালী এমনভাবে দখল ক'রে বসেছিল যে আপিস আর আড্ডা ছাড়া তার অন্য কাজ বা চিন্তা মাত্রও ছিল না। মাঝে মাঝে শেফালীর শাসন অসহ্য হয়ে উঠলেও রামেন্দু বেশ বুঝত যে সে শাসনে ন্যায়ত প্রতিবাদ করা চলে না। কাজেই

তাকে মেনে চলতে হ'ত। স্বামীর সাংসারিক অজ্ঞতা, এবং আত্ম-নির্ভরশীলতার একান্ত অভাব দেখে শেফালী তাকে ছেড়ে একটি দিনের জন্যও কোথাও যেতে চাইত না। শেফালীর মা ছিল না, বাপ রিটায়ার্ড ডেপুটি। ভাইয়েরাও সব কৃতী। তাঁদের বিশেষ অনুরোধেও শেফালী দু চার দিনের বেশি তাঁদের কাছে গিয়ে থাকত না। তাও যখনই যেত, কোন ছুটির সময়ে রামেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে। দুটিমাত্র ছোট ছেলেমেয়ে। মাষ্টার বাড়িতেই তাদের পড়ায়। ঝি, চাকর, বামুন সবই আছে, শেফালীকে নিজে হাতে কিছুই বড় করতে হয় না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে রামেন্দুই এ সব ব্যবস্থা করেছিল। সেলাইয়ের কল, এস্রাজ, বই, কখনও বা রান্না, কখনও বা ছেলেমেয়ে—এই সব নিয়েই শেফালী সময় কাটাত। শেফালীর একমাত্র অশান্তি যে সে স্বামীকে নিরিবিলি পেত সেই রাত এগারোটায়। চাকর বামুনের সঙ্গে রামেন্দুর কোন সম্বন্ধই ছিল না। একটা সুনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের মত সংসারটা স্বচ্ছন্দ গতিতে চ'লে যাচ্ছিল।

রামেন্দু যখন বাসায় ফিরল তখন রাত নটা। অনুযোগের স্বরে শেফালী বললে, এই তোমার সাড়ে আটটা? আমি আর তোমার সঙ্গে পেরে উঠি না। নাও, আর রাত করতে পাবে না। এখুনি খেতে ব'স।

খেতে ব'সে রামেন্দু বললে, এ সব কি? ভাত কই?

ভাত তোমাকে দিচ্ছি আর কি, সর্দ্দিতে ডবডব করছে মুখ-চোখ—

মুখখানা একটু বিকৃত ক'রে রামেন্দু বললে, জানই তো, লুচি পরটা আমি খেতে পারি না।

শেফালী গম্ভীরভাবে উত্তর করলে, তাই ব'লে তোমাকে অত্যাচার

করতে দিতে পারি না। লক্ষ্মীর মত খেয়ে নাও, অখাদ্য তো কিছু নয়।

খেতে খেতে রামেন্দু বললে, তাই তো, সর্দিটা সত্যিই বড় বেশি লেগেছে।

তবুও কি না বেরিয়ে ছাড়লে! আর এলেও সেই নটার পর। আমি আর কি করব বল, ছেলেমানুষ তো নও। আড্ডা পেলে তুমি সব ভুলে যাও।

রামেন্দু প্রতিবাদ ক'রে বললে, তোমাকে বাদে।

তা হ'লে আমার কথা রাখতে। একটি দিনও তো না গিয়ে থাকতে পার না।

কেন, তোমার অসুখের সময়ে?

ওঃ, সেই এক পেয়েছ বটে। নিতান্ত নিরুপায়, কি করবে—তাই। বাস্তবিকই একমাত্র শেফালীর কোন অসুখ হ'লে রামেন্দু বাড়ি ছেড়ে নড়ত না। এ কথা শেফালীর অস্বীকার করবার উপায় ছিল না। সে বললে, আমার অসুখ হ'লেই ভাল হয়।

কেন এ সব বলছ বল তো?

তা হ'লে তোমাকে কাছে পাই।

রামেন্দু বললে, শুধু বারটাই দেখ না শেফালী, প্রতিটি মুহূর্তেই যে আমার কাছে রয়েছ।

সিগারেটের কেসটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে শেফালী বললে, আজ আপিসে সিগারেট খেতে পাবে না।

না না, সে কি হয়, সারা দিন সিগারেট না খেয়ে কি ক'রে থাকব!

বেশ থাকবে 'খন। এই খুস্‌খুসে কাসির মধ্যে সিগারেট টানলে কি রক্ষে আছে! এই নাও যষ্টিমধু আর আদা, আপিসে দু এক কুচি ক'রে মুখে দিও। বিকেল নাগাদ দেখবে, কাসিটা কত কমে গেছে।

মুখটা বুজে নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গেই আদার কুচি, লবঙ্গ, তালের মিছরি আর যষ্টিমধু ভরা কৌটাটি রামেন্দু পকেটে রেখে দিল। তা হ'লে এখন আসি।—ব'লে পিছন ফিরতেই শেফালী বললে, বেশ তো, রাগের চোটে বুঝি আজ ব'লে যাওয়াও হবে না?

এই যে বললাম।

ওই বুঝি তোমার বলা?

রামেন্দু হেসে ফেলে ফিরে দাঁড়াল।

শরীরটা তত ভাল নয় ব'লে রামেন্দু সেদিন তিনটার সময়ে আপিস থেকে চ'লে এল। ছেলেমেয়ে দুটি নীচে বৈঠকখানায় ব'সে খেলা করছিল। রামেন্দুকে দেখে তারা ছুটে মাকে খবর দিতে যাচ্ছিল। রামেন্দু হাত নেড়ে তাদের নিষেধ করল,—আকস্মিক ভাবে আবির্ভূত হ'য়ে সে শেফালীকে চমক লাগিয়ে দেবে। বাইকখানা রেখে সে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। সিঁড়ির পেঁচের মুখে ছোটরকম একটা কলিশন হয়ে গেল। রামেন্দু মনে করেছিল শেফালী, নচেৎ সংঘর্ষটা সে এড়িয়ে যেতেও পারত। কে এই তরুণী—রামেন্দুর মুখের উপর দিয়ে একটা ত্বরিত দৃষ্টি সঞ্চালিত ক'রে সলজ্জ হাসিমুখে নেমে গেল!

সিঁড়ির দরজাতেই শেফালীর সঙ্গে দেখা হ'ল। দুজনেই যেন কেমন থতমত খেয়ে গিয়েছিল। শেফালী একটু সামলে নিয়ে বললে, এত সকাল সকাল যে, শরীর ভাল আছে তো?

তত সুবিধে নয়, তাই চ'লে এলাম।

তারপর আপিসের পোষাক ছাড়া হ'ল, হাত মুখ ধোওয়া হ'ল, তবু কারও মুখে একটি কথা নেই। ব্যাপারটা যেন কেমন বিশ্রী হয়ে যাচ্ছিল। রামেন্দু মনে করছিল যে সে জিজ্ঞাসা করবার আগেই শেফালী তার কৌতূহল নিবৃত্ত ক'রে দেবে। তা হ'ল না দেখে সে বাধ্য হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কথা বলছ না যে, নেমে গেল ওটি কে?

তাচ্ছিল্যের সঙ্গে শেফালী বললে, কে আবার, পাঁচীর মার পাঁচী।

পাঁচীর মা!

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, আমাদের ঝি।

সে রকম তো মনে হয় না। ওকে তো আর কোন দিন আসতে দেখি নি।

শেফালী যেন একটু বিরক্ত হয়ে বললে, তবে কি রকম মনে হয় আবার জানি না। দুপুরে মাঝে মাঝে আসে। তোমার দেখাব কারণ ঘটে নি, কাজেই দেখ নি! যাক, এখুনি চা খাবে কি?

পেলে তো ভালই হয়, কিন্তু ঠাকুর আসে নি যে!

কেন, আমি তো মরি নি। আর রোজ কি ঠাকুর তোমায় চা আর খাবার ক'রে দেয়? তবে অন্য দিন ষ্টোভ জ্বালতে হয় না, এই যা।

রবিবার। সকালে বেড়িয়ে ফিরতে প্রায় এগারোটা হয়ে গেছে। রামেন্দু বললে, এক গ্লাস জল দাও তো—ভয়ানক তেষ্টা পেয়েছে। শেফালী জল আনতে গিয়ে দেখে যে ঠাকুর রান্নাঘরে এক মহা বিপত্তি বাধিয়ে ব'সে আছে।

করেছ কি ঠাকুর! সব সর, যাও দিকি নি, আগে বাবুকে এই জলের গ্লাসটা দিয়ে এস।

গ্লাসটা হাতে নিয়েই রামেন্দু বারান্দার উপর সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। শব্দ হ'তেই শেফালী ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলে, অমন ক'রে ফেলে দিলে যে, কি হয়েছে?

হয়েছে আমার মাথা। আগুনের মত গরম জল এই তেষ্টার মুখে মানুষে খেতে পারে?

মুখখানি কালি ক'রে বিস্মিত ও অপ্রতিভ শেফালী বললে, এই সর্দ্দিকাসির ওপর এসেই ঠাণ্ডা জলটা খাবে, তাই আমিই গরম জল পাঠিয়েছি।

রাগের মাথায় রামেন্দু ব'লে ফেললে, যাও যাও, তোমার দরদের ঘায়েই আমার প্রাণান্ত। তুমি দেখছি মাকেও ছাড়িয়ে উঠেছ।

শেফালীর চোখ দুটি জলে ভ'রে উঠল। সে নত মুখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ দিয়ে তার কথা বেরুল না। স্বামীর কাছে এই তার প্রথম তিরস্কার। রামেন্দু দ্রুতপদে শোবার ঘরে চ'লে গেল। বাড়িসুদ্ধ লোক নীরব।

অপমানে, দুঃখে, লজ্জায় শেফালী ম'রে যাচ্ছিল। একটু সামলে নিয়ে সে ধীরে ধীরে স্বামীর অনুগমন করল। কেন এমন হ'ল! এই দীর্ঘ বারো বছরের মধ্যেও তো সে স্বামীর এমন মেজাজ দেখে নি!

চোরের মত এসে শেফালী স্বামীর পাশে দাঁড়াল। রামেন্দু

ততক্ষণে তার অপরাধ বুঝতে পেরেছিল। ছি ছি, কি ক'রে ফেলেছে সে,—বিশেষত লোকজনের সামনে! তারই জন্য তো শেফালীর এই সতর্কতা! আর, বিনিময়ে—! রামেন্দু শেফালীকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধ'রে বললে, অন্যায় করেছি শেফালী, ক্ষমা কর। স্বামীর আদরে শেফালীর জোর-ক'রে-আটকে-রাখা চোখের জল বাঁধ ভেঙে হু হু ক'রে বেরিয়ে এল। বেগটা একটু ক'মে এলে সে বললে, ওগো, তোমরা তো বোঝ না, কতখানি ভালবাসা কতখানি সতর্ক দৃষ্টি দিয়ে আগলে রাখতে চায় স্বামীকে তাদের এই আশ্রিত জীবগুলো! তাদের ভালবাসাটাকে তুচ্ছ ক'রে উড়িয়ে দিও না। মায়ের চেয়ে কি তারা কম ভালবাসে? মা যে একটি সন্তানের অভাব আর একটিকে বুকে চেপে ধ'রে সামলে ওঠে, কিন্তু স্বামীর অভাব যে কিছুতেই পূরণ হয় না। বউগুলোর জ্বালা জুড়বার যে আর স্থান নেই। জান কি তোমরা, কেমন ক'রে নিজেকে নিঃস্ব ক'রে আত্মহারা হয়ে তারা স্বামীকে ভালবাসে? তোমরা যাই হও না কেন, তাদের কাছে তোমরা কত বড় আদরের সম্পদ।—শেফালীর কথা আটকে গেল।

ক্ষমা চাচ্ছি শেফালী, আর ব'ল না।

তবে বল যে আর অমন করবে না।

না।

শেফালীর মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল।

খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাজা বাসনগুলি এনে রান্নাঘরের বারান্দায় রেখে পাঁচীর মা বললে, পোড়া বাতও যেন পেয়ে বসেছে। দুদিন যে ব'সে চিকিচ্ছে হব সে কপালও নেই। ও ঠাকুর, চললাম বাছা, আর পেরে উঠলাম না। যাই, গিয়ে পাঁচীকে পাঠিয়ে দিই।

ঠাকুর হাসতে হাসতে বললে, এই না তুমি হনহন ক'রে হেঁটে

এলে পাঁচীর মা, এরি মধ্যে যে একেবারে ঢেঁকিতে পাড় দিতে লাগলে!

পাঁচীর মা ফিরে দাঁড়িয়ে হাতমুখ নেড়ে ব'লে উঠল, তুমি কেমন মানষের ছেলে গা? কথায় বলে—ঘুঁটে পোড়ে আর গোবর হাসে।

শেফালী তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে পাঁচীর মা, চেঁচাচ্ছ কেন?

দেখ দিকি মা, বাতে পঙ্গু হয়ে যেতে বসেছি, তা ওই বামুনঠাকুর মস্কারা করতে নেগেছে। বলে কি না আমি হনহন ক'রে চলি। আ মর, আমি পেত্নী নাকি? খোঁড়াতে খোঁড়াতেও মুনিবের কাজ করছি। বলি, নুন খাই যার গুণ গাই তার। তোমাদের মত নিমকহারাম নাকি? বলে কিনা ঢেঁকি পাড়াচ্ছি। আমার সাত-পুরুষেও ঢেঁকি পাড়ায় নি। কেমন মানষের মেয়ে আমি! আজ না হয় বরাতেই এমন করেছে। তা যাক মা, বামুন মানুষ, গালমন্দ তো দিতে পারি নে। যাই, গিয়ে পাঁচীকে পাঠিয়ে দিই, বাকি কাজগুলো সেরে দিয়ে যাক।

শেফালী বললে, আচ্ছা, আমি ঠাকুরকে ব'কে দিচ্ছি। তুমি যাও পাঁচীর মা, তোমার মেয়েকে আর পাঠাতে হবে না।

সে কি হয় মা? ক'দিন এখন প'ড়ে থাকি তার ঠিক কি? এমন সোনার মুনিব, চাকরি তো রাখতে হবে।

চাকরির ভয় নেই তোমার। তুমি যাও, বাকি কাজ হাতে হাতে সেরে নিলেই হবে 'খন।

শেফালী বললে, ওগো, একটা কথা বলব ?

বল না, এত চিন্তা কেন ?

যদি রাগ কর। তোমার যা মেজাজ হয়ে উঠেছে, ভয় করে।

খুব যে বলছ দেখছি! ব'লেই ফেল না, রাগ করব না।

শেফালী সঙ্কোচের সঙ্গে বললে, বাইরের ওই বারান্দাটায় কলমুখো হয়ে ব'স না।

কেন বল দেখি ?

সব বাড়ির মেয়েরা জল নেয়, তারা যদি কিছু মনে করে। কেউ যদি বলে, 'ওই রামেন ডেপুটি—'। জিব কেটে শেফালী থেমে গেল।

জোর ক'রে একটু হাসির ভাব এনে রামেন্দু বললে, নাম ক'রে ফেললে ?

প্রণাম করছি।—ব'লেই শেফালী মাথা নীচু ক'রে স্বামীর পায়ের ধুলো নিল। রামেন্দুর মনে কথাটা বেশ একটু আঘাত করল। শেফালী কি তাকে এত ছোট মনে করে ? সে প্রকাশ্যে বললে, এই কথা ? আচ্ছা।

শেফালী তার সেই ভাবটা লক্ষ্য ক'রে কথাটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নেবার জন্যে বললে, হ্যাঁগা, 'সাব'টা উঠে যাবে কবে ?

মাঝে মাঝে তো আশা পাই, কিন্তু হয় কই ?

রামেন্দু মনে মনে ভাবছিল, প্রতি পদে কি সাংঘাতিক শাসন, আর কি তীক্ষ্ণ শ্যেনদৃষ্টি এই স্ত্রীজাতির !

ভবেনবাবু সিনিয়র ডেপুটি, এক পল্লীতেই বাসা। সকালে মাইল দুই বেড়ানো তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক কাজ। রামেন্দু বৈঠকখানায় ব'সে

খবরের কাগজ পড়ছিল। তাঁকে দেখেই সে নমস্কার ক'রে বললে, বসবেন না? ভবেনবাবু বসলে রামেন্দু বললে, আপনাকে তো ক্লাবে বা অন্য কোথাও পাওয়া যায় না?

ভবেনবাবু হাসতে হাসতে উত্তর করলেন, না গেলে পাবে কি ক'রে?

আপনার কথা মাঝে মাঝে হয় কিনা।

হয় নাকি?

এস.ডি.ও. বলছিলেন, আপনি কোথাও বার হন না।

তা বলুক না। সামাজিকতা রাখতে যতটা দরকার তাতে আমার ত্রুটি নেই। তবে সন্ধ্যা থেকে রাত এগারোটা পর্য্যন্ত আড্ডা, ও আমি আদৌ পছন্দ করি না। সকালবেলাটা চিঠিপত্র লিখতে, পড়াশুনা করতে, বা কেউ এলে তাদের সঙ্গে আলাপ করতে কেটে যায়। সারা দিন তো আপিসে। তারপর দুপুর রাত অবধি যদি বাইরেই কাটে, তা হ'লে বাড়ির লোকদের ওপরে অত্যাচার করা হয় না? ছেলে, মেয়ে, স্ত্রী, এদেরও তো ইচ্ছা হয় একসঙ্গে ব'সে দুটো কথা বলতে। এদের ওপরেও তো একটা কর্ত্তব্য আছে, আশ্রিত ব'লে এত অবহেলা করলে চলবে কেন? স্ত্রীর কথা না হয় ছেড়েই দাও, ছেলেমেয়েরা মুখে কিছু বলতে পারে না বটে, কিন্তু মনে মনে অনুভব করে।

ভবেনবাবু যে তাকে এইভাবে আক্রমণ করবেন তা রামেন্দু ধারণা করতে পারে নি। প্রতিবাদ করবার বিশেষ কিছু নেই বুঝে সে আস্তে আস্তে বললে, সবাই তো ঠিক সে রকম বোঝে না।

ভবেনবাবু হাসতে হাসতে উত্তর করলেন, বোঝে সবাই, তবে অভ্যাসটা ছাড়তে পারে না, এই যা। কেন, সন্ধ্যা অবধি বেড়ালেই তো চলে, সব দিক বজায় থাকে।

আরও কিছুক্ষণ আলাপের পর ভবেনবাবু বিদায় নিলেন। রামেন্দু ভিতরে এসে শেফালীকে ডেকে বললে, সেদিন থিয়েটার শুনতে গিয়ে কি হয়েছিল তোমাদের মধ্যে ?

শেফালী একটু হেসে বললে, কার কাছে শুনলে ? হবে আর কি ? ভবেনবাবুর স্ত্রী আমার কাছে বসেছিলেন। শচীবাবু আর হেমবাবু ডেপুটির স্ত্রী তাঁকে বার বার অনুরোধ করলেও তিনি আমায় একা রেখে যেতে চাইলেন না। তাইতে তাঁরা আমাকে শুনিয়ে সাবডেপুটির বউ ব'লে উপহাস করেছিলেন। ভবেনবাবুর স্ত্রী তাতে বেশ শক্ত ক'রে দুকথা শুনিয়ে দিয়েছিলেন। আমি কিন্তু কিছুই বলি নি।

তা আমাকে বল নি তো!

শেফালী মুখখানি নীচু ক'রে বললে, এ আর বলার কথা কি ? রামেন্দু বুঝল, তার মনে কষ্ট হ'তে পারে ব'লে শেফালী ইচ্ছা ক'রেই কথাটা তার কাছে চাপা দিয়েছে। আর এই সব বন্ধুদের বাড়িতেই সে নিত্য ব'সে রাত দুপুর পর্য্যন্ত আড্ডা দেয়!

রামেন্দু যে স্ত্রীকে ভালবাসত না তা নয়, তবে সর্ব্বদা একসঙ্গে থাকাতে ভালবাসার পরিমাণটা ওজন ক'রে দেখার সুযোগ ঘ'টে ওঠে নি। শেফালী যে তার সমস্তখানি প্রয়াস, সমস্তখানি চিন্তা ও অনুভূতি দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত্ত তাকে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছে, শেফালীর আপনহারা ভালবাসা যে তার উপেক্ষা ও কঠোরতায় আঘাত পেয়ে মুষড়ে প'ড়েও আবার আঁকড়ে ধরছিল তাকেই প্রাণপণ প্রয়াসে, তা সে অনুভব করছিল না তা নয়। তবুও পদে পদে, খেতে বসতে শেফালীর বিধি-নিষেধ ও অনুশাসন তার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। রামেন্দু ভাবছিল, কিছু দিন একা থাকতে পারলে যেন ভাল হয়। কিসের অসুবিধা ? বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও তো কেউ কেউ থাকে। তাদের কি দিন চলে না ? শেফালী

বুঝুক যে আমিও তাকে ছাড়া বাঁচতে জানি। অধিকন্তু, কিছু দিন ছাড়াছাড়ি হ'লে একটা নূতনত্ব আসবে, মিলনের সুখই তো বিরহে। জীবনটা যেন বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে।

বাস্তব জীবনের অনেক ঘটনা কল্পিত নাটকের চেয়েও অভাবনীয় হয়ে পড়ে। হঠাৎ শেফালীর বাবার কাছ থেকে এক চিঠি এল যে অন্তত মাসখানেকের জন্য এবার শেফালীকে পাঠাতেই হবে। তাঁরা পুরীতে যাচ্ছেন, শেফালীর সমুদ্র দেখার খুব কৌতূহল। চিঠির উত্তর পেলেই শেফালীর ভাই এসে তাকে নিয়ে যাবে।

চিঠিখানি শেফালীর হাতে দিয়ে রামেন্দু বললে, কি বল?

শেফালীর মোটেই যাবার ইচ্ছা ছিল না। স্বামীকে ছেড়ে সে স্বর্গও চাইত না। সে হঠাৎ ব'লে ফেললে, যাব। রামেন্দু এই সুযোগই খুঁজছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করলে, বেশ, তবে লিখে দিই নিয়ে যেতে। এই রকম উত্তর পাবার জন্য শেফালী একটুও প্রস্তুত ছিল না। বরং ঠিক এর বিপরীতটাই সে প্রত্যাশা করেছিল। দারুণ অভিমান তার কণ্ঠ রোধ ক'রে দিল, দুঃখে তার বুক ভ'রে গেল। স্বামীর কাছে কি সে এতই অপ্রয়োজনীয়, তার এই প্রাণপণ সেবার কি কোন মূল্যই নেই? অতি কষ্টে সে বললে, দাও।

চিঠিখানি পোষ্ট করতে পাঠিয়ে রামেন্দু বললে, আচ্ছা, এবার তো একটুও আপত্তি করলে না যেতে? কিছুদিন খুবই আমোদে থাকবে বটে। এখন আর কি, ফুর্তি কর!

আঘাতের উপর আঘাত। পুরুষের দৃষ্টিশক্তি কি সত্যই এত কম, না কপটতার ঠুলি প'রে তারা নিজেরাই অন্ধ সাজে তাদের একান্ত আশ্রিতাগুলিকে প্রতারিত করবার জন্য?

শেফালীর মুখে একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠল।

অরু ও খোকা বাপের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেজেগুজে আগেই গিয়ে গাড়িতে চ'ড়ে বসেছিল। শেফালী বিদায় নিতে এসে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে রামেন্দুর পায়ের ধুলো নিল। মুখখানি মুখের কাছে আনতেই রামেন্দু দেখল, শেফালীর চোখ দুটিতে জল টলটল করছে। রামেন্দুর মনটাও যে খুব ভাল ছিল তা নয়। সে বললে, ছি শেফালী, চোখে জল কেন? বাপ-ভাইদের নিয়ে পুরীতে বেশ আমোদেই থাকবে, আর কটা দিনের জন্যেই বা!

শেফালী ভাঙা গলায় উত্তর দিল, তোমার যে বড় কষ্ট হবে, তাই। সে আরও বলতে যাচ্ছিল, ওগো, তোমায় ছেড়ে আমার কোন আমোদ হবে না, কেন আমায় পাঠালে? কিন্তু মুখে তার কথা বেরুল না।

কি করুণ দৃষ্টি! রামেন্দুর বুকের ভিতরে হৃদ্‌পিণ্ডটা একটা মোচড় দিয়ে উঠল। আর ফেরবার উপায় নেই, গাড়ি প্রস্তুত।

শেফালীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে খালি বাড়িতে ঢুকে রামেন্দুর নিজেকে বড়ই একাকী, বড়ই নিঃসহায় ব'লে মনে হতে লাগল। অত বড় বাড়িখানার মধ্যে সে যেন তার নিজের অস্তিত্বই খুঁজে পাচ্ছিল না। কত বড় পরিপূর্ণতা দিয়ে শেফালী সমস্ত বাড়িটা ভরপুর ক'রে রেখেছিল, বিগ্রহশূন্য মন্দিরের পূজারীর মত সজল চোখে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে রামেন্দু তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করতে লাগল। সুযোগ পেয়ে একটা বিরাট শূন্যতা রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার আধিপত্য বিস্তার ক'রে ফেলেছে। উপরে, নীচে, ঘরে, বাইরে, অস্থির চিত্তে পাদচারণা ক'রে রামেন্দু হাঁপিয়ে উঠল। বৈঠকখানায় মাষ্টার, উড়ে চাকর ঘর

ঝাড়ছিল, ঠাকুর রান্নার আয়োজন করছিল, পাঁচীর মা বাসন মাজছিল। রামেন্দুর মনে হচ্ছিল সব যেন প্রাণহীন বায়স্কোপের ছবি। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

দু-তিন দিন কেটে গেল। কেউ আর প্রতিটি কাজে তাকে বাধা দেয় না, বেড়িয়ে ফিরতে দেরি হ'লে কেউ আর অনুযোগ করে না, ছেলেমেয়ের কণ্ঠধ্বনি আর তাদের ছোট ছোট পায়ের ধুপধাপ শব্দে বাড়িটি আর মুখরিত হয়ে ওঠে না। স্নানের সময় জলের উষ্ণতাটুকু কেউ আর পরীক্ষা ক'রে দেয় না, খেতে বসলে একটা আগ্রহভরা স্নেহ দৃষ্টি দিয়ে আহার্য্যের গুণাগুণ বিচার ক'রে—এটা খাও, ওটা খেও না ব'লে কেউ আর অনুরোধ করে না। রামেন্দু এখন স্বাধীন।

ক্রমেই অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। বাজারের খরচ, ধোবার হিসাব, কি খেতে হবে তার হুকুম, কি পরতে হবে তার ব্যবস্থা, লাইফ ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়ম, মুন্সেফবাবুর মেয়ের বিয়ের তত্ত্ব, গয়লার আগাম টাকা, সব একসঙ্গে এসে রামেন্দুকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলল। কি দুঃসহ, কি তিক্ত এই স্বাধীনতার আস্বাদ!

রান্নাঘরে পাঁচীর মা ও ঠাকুরের মধ্যে কথা হচ্ছিল। দু-চারটি কথা রামেন্দুর কানে গেল। পাঁচীর মা বলছিল, বাবু যেন পেটটা ভ'রে খেতেই পায় না, ক দিনেই যে শুকিয়ে গেল। কেমন রাঁধছ ঠাকুরমশায়? শোবার ঘরটাও দেখনু এরই মধ্যে নণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছে। গোছগাছ করে কে? মেয়েছেলে নইলে কি আর বাড়ি? দেখেই আমার গা নসখস করছে। কি করব, নিজের অত বলও নেই, আর এসব পারিও নে। হ্যাঁ, তবে পাঁচী হ'লে হ'ত। ঠাকরুণের মানা, তাই তো ভরসা পাই নে।

রামেন্দুর কিছুই ভাল লাগে না। তাসের আসর, গল্পগুজব,

মজলিস কোন তাতেই তার আর সে আগ্রহ নেই। শেফালীর কাছে বাধা পেয়ে যে উৎসাহ তার বেড়ে উঠেছিল, বিনা বাধায় আপনা থেকেই তার বেগ ক'মে গেল। মনে সুখ না থাকলে কিছুই ভাল লাগে না। রামেন্দুর এই পরিবর্ত্তন বন্ধুবান্ধবদের লক্ষ্য করতে দেরি হ'ল না। তাব নিজেরই মনে হচ্ছিল, সে যেন কেমন লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেছে। সন্ধ্যার পর রাস্তার দুই পাশের বাড়িগুলিতে যখন অবাধে গ্রামোফোন বাজতে থাকে, এস্রাজ, হারমোনিয়ামের সঙ্গে নারীকণ্ঠের মধুর ধ্বনি যখন চারদিক মুখরিত ক'রে তোলে, স্বামী-স্ত্রীর একটা প্রাণখোলা মিশ্রিত হাসি যখন বাতাসের সঙ্গে দোল খেয়ে ভেসে আসে, রামেন্দু তখন একটা নির্জ্জীব মন নিয়ে ধীরে ধীরে বাসায় ফেরে। বিশ্ব-সংসারের সমস্ত আনন্দ-উৎসব থেকে সে যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। নিজের ওপর রাগে ও দুঃখে সে মর্ম্মাহত হয়ে পড়ে। কেন সে শেফালীকে যেতে দিল? সে তো মোটেই যেতে চায় নি।

শেফালীর প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি কাজ তার মনে পড়তে লাগল, আর সে ক্রমেই অস্থির হয়ে উঠতে লাগল। কায়মনোবাক্যে শেফালী যে শুধু তাকেই ভালবেসেছে, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি ব্যাপারে এখন সে তা উপলব্ধি করতে লাগল। সব স্নেহের আস্বাদ সংসারে বুঝি একমাত্র স্ত্রীর প্রেমেই বর্ত্তমান—পিতার শাসন, মায়ের স্নেহ, ভগ্নীর প্রীতি, অপত্যের আবদার, পত্নীর প্রেম। কি পবিত্র! কি মধুর! রামেন্দু যেন বিশ্ব-সংসারের মধ্যে থেকেও নেই। অশান্ত মন তার চিন্তার স্রোতে হাবুডুবু খেতে লাগল।

জামাটা পাঁচ দিন ধ'রে পরা হচ্ছে, আর চলে না। বাক্স খুলে একটা জামার ভাঁজ ভেঙে রামেন্দু দেখল বোতাম নেই। সেটাকে সরিয়ে রেখে আর একটা বার করল। সেটার গলার কাছটা ফেঁসে

গেছে। সেটাকে ছুঁড়ে ফেলে আর একটা টেনে বার করল। কি জ্বালা! এটাও অচল। রামেন্দু নিজের উপরই ক্ষেপে উঠল। কোথায় স্থচ-স্থতো, কোথায় বোতাম! সবই শেফালী গুছিয়ে রেখে গিয়েছিল। নিরুপায় রামেন্দু জামার বোতাম পরাতে বসল।

পাঁচীর মা সব লক্ষ্য করছিল। সে রামেন্দুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, এ রকম ক'রে কি চলে গা! ঠাকরুণের কি অন্যায়! একে পুরুষমানুষ, তায় হাকিম নোক, এত ঝক্কি কি পোয়াতে পারে! —একেই তো আগে থেকেই কথাবার্ত্তা বড় ছিল না। তারপর শেফালী যাবার পরে পাঁচীর মার সঙ্গে রামেন্দু এখনও একটি কথাও বলে নি। যথেষ্ট ফাঁক খুঁজেও পাঁচীর মা রামেন্দুর সঙ্গে কথা বলবার স্থযোগ পাচ্ছিল না। কথা না ব'লে ব'লেও রামেন্দু হাঁপিয়ে উঠেছিল। পাঁচীর মাকে দেখে সে ব'লে ফেললে, সত্যিই বড় অস্থবিধায় পড়েছি, সবই বে-গোছাল হয়ে পড়েছে। ওদের আসবার জন্যেই লিখে দিই।

পাঁচীর মা স্থযোগ পেয়ে স্থর বদলে বললে, সে কি হয় বাবু? মুখেই যেন বলি যে ঠাকরুণের অন্যায়। এই তো সবে গিয়েছে বাপ ভাইয়ের কাছে, কত বচ্ছর পরে। দু পাঁচ দিন না থেকে কি আসতে চায়, আর তারাই কি ছাড়বে? তবে হ্যাঁ, ঠাকরুণ যদি মানা ক'রে না যেত তবে আপনার গায়ে আঁচটি নাগতে দিতুন না।

রামেন্দু জিজ্ঞাসা করলে, কিসের মানা পাঁচীর মা?

মানা? ওই পাঁচীর কথা। ঠাকরুণের একটু আধিক্যেতা আছে। তাকে আসতে মানা ক'রে গেছে।

পাঁচী! রামেন্দু কি উত্তর দেবে খুঁজে পাচ্ছিল না। তাকে নিরুত্তর দেখে পাঁচীর মা একটু জোর দিয়ে বলতে লাগল, কি আর বলব বাবু, ঘর দরজা সব এমন চকচকে ক'রে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখত

যে টেরও পেতেন না—ঠাকরুণ বাড়িতে নেই। শত হ'লেও রামুনের মেয়ে তো। ওর বাপ যতদিন বেঁচে ছিল ইস্কুলে ল্যাখাপড়া শিখিয়েছে, হারমোনি বাজিয়ে গান গায়। ভদ্দরনোকের মেয়ে, আদবকায়দা সব জানে বাবু, সব জানে।

রামেন্দুর বুকের মধ্যে কে যেন একটা বড় রকমের ধাক্কা দিল। সে বললে, না না, ওরা এখানে নেই, সেটা ভাল দেখায় না। কথার আঁচে রামেন্দুর দুর্ব্বলতা টের পেয়ে পাঁচীর মা বললে, কিছু মন্দ দেখায় না বাবু, তুমি হচ্ছেন হাকিম নোক। রেখে যাও তো ঘরের চাবিটা আজ। ঠাকরুণ এলে যা বলতে হয় আমিই বলব।

না না, তোমায় কিছু বলতে হবে না।—ব'লেই রামেন্দু বেরিয়ে গেল। শোবার ঘরের চাবি দরজাতেই র'য়ে গেল।

আপিস থেকে এসে রামেন্দু দেখলে যে ঘরদুয়ার আসবাবপত্র বাস্তবিকই সব ফিটফাট। টেবিলটি সাজানো, আলনায় কাপড় জামা গোছানো, বিছানাটি পরিপাটি। হাতমুখ ধোবার পর ঠাকুর এসে খাবার দিয়ে গেল। একটু পরেই একখানি ঝকঝকে রেকাবিতে দুটি পান নিয়ে ধীর পদক্ষেপে পাঁচী এসে উপস্থিত হ'ল। রামেন্দু তাকাতেই আবার সেই সলজ্জ হাসি। রেকাবিখানা টেবিলের উপর রেখে সে নিঃশব্দে বেরিয়ে যাচ্ছিল। সুন্দর সংযত গতি, চাহনিতে কি লালিত্য! এই শিষ্টা তরুণী পতিতার কন্যা! তার সারাদিনের পরিশ্রমের বিনিময়ে একটা কথাও কি সে প্রত্যাশা করতে পারে না? রামেন্দু ঢোক গিলে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, তোমার মা আসে নি?

না, এখুনি আসবে।

রামেন্দু আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল, কিন্তু শেফালীর মস্ত বড় অয়েলপেন্টিংখানার দিকে চোখ পড়তেই ভাষা তার রুদ্ধ হয়ে গেল। পাঁচী একটু থমকে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে স'রে গেল।

বিভিন্ন বৃত্তিগুলি সব দুই দল হয়ে রামেন্দুর মনের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড যুদ্ধ বাধিয়ে দিল। তাদের সংঘাতে রামেন্দুর চিত্ত ক্রমেই ক্ষতবিক্ষত ও দুর্ব্বল হয়ে পড়তে লাগল।

শেফালীর চিঠি সে রীতিমতই পাচ্ছিল—শুধু অনুরোধ আর কুশল প্রশ্ন। শেফালীর নিজের কথা তাতে কিছুই নেই।

রামেন্দু বুঝতে পারছিল, সে যেন কেমনতর খাপছাড়া হয়ে পড়ছে; আর সেই সঙ্গে বন্ধুবান্ধব প্রতিবেশীরাও যেন সব ক্রমেই স'রে দাঁড়াচ্ছে। ভবেনবাবুর বাড়ির মেয়েরা প্রথম প্রথম খুব তত্ত্বাবধান করত, এখন আর কোন খবর নিতে আসে না। ভবেনবাবুও যেন ভার ভার, ঠিক আগেকার মত নেই। চিন্তার পর চিন্তার স্রোত। অবশেষে রামেন্দু সাব্যস্ত করল যে এসব তার বাজে কল্পনা। যে যার নিজের নিয়েই ব্যস্ত, নিত্য কে কার খবর রাখে!

শরীর ও মন দুই-ই খারাপ। সামান্য কিছু আহার ক'রেই রামেন্দু শুতে গেল। মশারিটা ধ'রে টান দিতেই একটা কোণ খুলে গেল। রামেন্দু ব'লে উঠল, নাঃ, আর পারা যায় না। সঙ্গে সঙ্গেই পাঁচীর মার কণ্ঠ শোনা গেল, ওরে পাঁচী, শুনছিস নে বোকা মেয়ে,

বাবু রাগারাগি করছে? যা না, দেখ গিয়ে কি বলে! পাঁচী আজ এখনও বাড়ি যায় নি।

দরজায় মৃদু পায়ের শব্দ হ'তেই রামেন্দুর বুকের মধ্যে ধড়াস ক'রে উঠল। মশারির দড়িটা বাঁধতে বাঁধতে সে বললে, না না, তোমাকে আর আসতে হবে না। পাঁচী থেমে গেল বটে, কিন্তু দাঁড়িয়েই রইল, গেল না।

রান্নাঘরে পাঁচীর মা ও ঠাকুরে কথা হচ্ছিল। ঠাকুর বললে, এই সময়ে ভাত নিয়ে যাও না চ'লে। কেন আর রাত করছ? বাবু তো শুয়ে পড়লেন।

পাঁচীর মা ঝঙ্কার ক'রে ব'লে উঠল, তোমার কোন্ দেশী আক্কেল গা ঠাকুর, তুমি কেমন নোক গা? এতখানি রাত হয়েছে, রাস্তা-ঘাটে রাজ্যির কুচরিত্তির নোক কেত্তন ক'রে ফিরছে, এখন এই সোমত্ত মেয়ে নিয়ে পথ ভেঙে আমি বাড়ি যাব? কেন, আমাদের কি মান-ইজ্জত নেই?

পাঁচীর মার দাপটে ঠাকুর বোকা ব'নে থেমে গেল। মাষ্টার ভাত খেয়ে মুখ ধুচ্ছিল। নিতান্ত নিরীহ মানুষ, মুখে কথাটি নেই। ব্যাপার দেখে সে বেচারী আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে ব'লে উঠল, তাই ব'লে কি তোমরা রাতে এখানে থাকবে নাকি? সে হবে না বাপু, মা নেই বাড়ি। না হয় কেউ এগিয়ে দিয়ে আসবে এখন। উড়ে চাকর গোবর্দ্ধনের ভরসা পেয়ে পাঁচীর মা সুর চড়িয়ে উত্তর করল, কেন, থাকলাম তা হয়েছে কি? নেই বা থাকল মা বাড়ি। ঘর তো একটা খালি প'ড়েই রয়েছে। কত বড় হুকুম! কথার ছিরি দেখ না! ভেবেছিনু ঢোঁড়া সাপ, ওমা, এ যে দেখছি তেড়ে কামড়ায়!

ব্যাপারটা বড়ই বিশ্রী হয়ে দাঁড়াল। সব কথাই রামেন্দুর কানে যাচ্ছিল। পাঁচী তখনও দরজায় দাঁড়িয়ে। কাকে কি বলবে ঠিক করতে না পেরে রামেন্দু হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল, চিত্তের দুর্ব্বলতা এলে যা হয়।

হঠাৎ সব কোলাহল ছাপিয়ে সদর দরজায় এক গুরুগম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল, টেলিগ্রাম হ্যায় হুজুর। চক্ষের পলকে সমস্ত চিন্তা তৃণরাশির মত প্রবল বন্যায় ভেসে গেল। রামেন্দুর সমস্ত শরীরের রক্ত ঝাঁ ক'রে মাথায় গিয়ে উঠল। ঝড়ের মত সিঁড়ি ভেঙে নেমে এসে সে কম্পিত হস্তে পিওনের কাছ থেকে টেলিগ্রামখানা নিয়ে দস্তখত ক'রে দিল। হৃদ্‌যন্ত্রের বেগ অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে গিয়েছিল। এত রাত্রে টেলিগ্রাম! "Come immediately. Sefali ill.—Jogendra"

শারীরিক অসুস্থতা, মানসিক দুর্ব্বলতা সব একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণীবাত্যায় তূলোর মত উড়ে গেল। কোন চিন্তা নেই, শুধু শেফালী আর শেফালী। দশটায় ট্রেন, তখন পৌনে নটা।

গোবরা, আলো নিয়ে আয়। ঠাকুর, গাড়ি ডাক। রামেন্দু পাগলের মত ভবেনবাবুর বাড়ির দিকে ছুটল।

ছুটির দরখাস্তটা ভবেনবাবুর হাতে দিয়ে রামেন্দু বললে, যা করতে হয় করবেন, আমি রওনা হলাম। গম্ভীরভাবে ভবেনবাবু বললেন, সে জন্যে ভাবনা নেই। আর দেরি ক'র না, ট্রেন ধরা চাই-ই।

সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে রামেন্দু গিয়ে পুরীতে পৌঁছল। বাড়ির গেটে ঢুকতেই অরু ও খোকা কোথা থেকে তীরের মত এসে রামেন্দুকে আঁকড়ে ধরল; জন্মে অবধি তারা আর কখনও এমন ক'রে ধরে নি। রামেন্দু অতি স্নেহে তাদের গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে

সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, তোদের মা কোথায়? দুজনেই ব'লে উঠল, মা সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেছে। পায়ের তলা থেকে যেন মাটি স'রে গেল। পড়তে পড়তে অস্ফুটস্বরে রামেন্দু জিজ্ঞাসা করল, তোরা যে যাস নি?

আমরা আগে আগে দাদুর সঙ্গে চ'লে এসেছি। মা আর মামীমা মামার সঙ্গে আসছে।

রামেন্দুর বুকের উপর থেকে যেন একখানা প্রকাণ্ড পাষাণ নেমে গেল। সহস্র দুশ্চিন্তার বোঝা একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে বার ক'রে দিয়ে সে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

তবে, এ টেলিগ্রামের মানে কি! আর এক ভাবনায় রামেন্দুর মনটা ধড়ফড় ক'রে উঠল।

সাদরে ও সাগ্রহে রামেন্দুকে কাছে বসিয়ে যোগেন্দ্রবাবু বললেন, বড় রোগা দেখাচ্ছে তোমায়, পথে কোন কষ্ট পাও নি তো?

আজ্ঞে না।

তবে ভবেনের চিঠিতে পাচ্ছি তোমার খুব অসুবিধে হচ্ছিল।

রামেন্দু বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করল, ওখানকার সিনিয়র ডেপুটি ভবেনবাবু?

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ভবেন। He is one of my best junior **friends**, ও তো weekএ দুখানা ক'রে চিঠি দিচ্ছে, আর খুব **exhaustive.** কেন, তোমায় ব'লে নি কিছু?

কই, না।

যোগেন্দ্রবাবু হাসতে হাসতে বললেন, ও আবার একজন writer কিনা, নানা রকম novelty ওর।

রামেন্দুর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। যোগেন্দ্রবাবু বলতে লাগলেন, দেখ, শেফালী আর এখন আমাদেব কাছে থাকতে চায় না। এখানে এসে সবাই আমরা তাজা হয়ে উঠেছি, ও কিন্তু শুকিয়েই যাচ্ছে। না না, তোমাদের আলাদা থাকা চলবে না।

রামেন্দু নীরব।

কম্পিত আগ্রহে শেফালীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে রামেন্দু বললে, যতদিন বেঁচে থাকব, আর এক দিনের জন্যও ছাড়ছি না।

মেঘভাঙা জ্যোৎস্নার মত সজল চোখে অধরে হাসি ফুটিয়ে শেফালী বললে, কেমন মজা! আর ছাড়াছাড়ি থাকবে?

নীলকুঠি

সে অনেক দিনের কথা। গ্রীষ্মের ছুটি। বিকাশদের বাড়িতে প্রতি বৎসর এই সময়ে যেমন আম-খাবার নিমন্ত্রণ থাকত, সেবারও তেমনই ছিল। শহর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে তাদের বাড়ি। তারা জমিদার। সব আম' যখন ফুরিয়ে আসত তখন বিকাশদের বাগানে রকমারি আম সুপক্ক হয়ে উঠত। বিকাশরা দু ভাই। বিকাশের দাদা প্রকাশকে আমরাও দাদা ব'লে ডাকতাম। প্রকাশদা আমাদের অপেক্ষা বারো চোদ্দ বছরের বড় ছিলেন। বয়সের এতটা তারতম্য সত্ত্বেও তাঁকে আমরা নিজেদের একজনের মতই মনে করতাম। যে সময়ের কথা বলছি তার পূর্ব্বে তাঁদের পিতৃবিয়োগ হয়। প্রকাশদা চিরকুমার থাকবেন মনস্থ ক'রে কয়েক মাস পূর্ব্বে বিকাশের বিবাহ দিয়েছিলেন। প্রকাশ সর্ব্বদাই প্রেততত্ত্বের আলোচনা নিয়েই থাকতেন। থিওসফিকাল সোসাইটির নানা রকম ইংরেজী এবং বাংলা বই কিনে তিনি তাঁর ঘর বোঝাই ক'রে ফেলেছিলেন। এই সব বই অন্য কারও পড়বার হুকুম ছিল না। বৈষয়িক কার্য্যে তাঁর মন ছিল না এবং কথাবার্ত্তাও খুব কম বলতেন। কিন্তু লোকটি ছিলেন খুব মধুর স্বভাবের। সহজে তাঁকে কোন তর্কের মধ্যে টেনে আনা যেত না। তবে বিশেষ অনুরোধে প'ড়ে মাঝে মাঝে তিনি

প্রেত-জগতের কিছু কিছু সংবাদ আমাদিগকে দিতেন। অনুপযুক্ত-বিধায় গূঢ়তত্ত্বের আলোচনা না ক'রে দুই একটি ঘটনা ব'লেই তিনি আমাদের কৌতূহল নিবৃত্ত করতেন, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকতাম।

এই রকম এক আম-খাবার নিমন্ত্রণেই সেবার বিকাশদের বাড়িতে গিয়েছি।

সে বছর বর্ষা বড় সকাল সকাল নেমেছিল। জ্যৈষ্ঠ মাস। জমাট-বাঁধা মেঘ। আকাশে একটুও ছিদ্র নেই, মাঝে মাঝে ক্ষীণ বৃষ্টিধারা এক একটা দমকা বাতাসের সংঘাতে চূর্ণ হয়ে এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। খাল বিল ডোবা তখনও ভ'রে ওঠে নি। নতুন বর্ষার জল পেয়ে ব্যাঙেরা কেবল স্বরসাধনা করতে সুরু করেছে আর সন্ধ্যা থেকে ঝিঁঝি পোকারাও তাদের সঙ্গে তান ধরেছে। ঝোপজঙ্গল আর আগাছা চারিদিকে সবেমাত্র তাজা হয়ে উঠেছে।

বিকাশদের বাড়ির পিছনের একটা নিরিবিলি দোতলার ঘরে আমাদের থাকবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। রাত্রি তখন সাড়ে আটটা কি নটা। আমরা কজন তাস নিয়ে বসেছি, আর অনিল হারমোনিয়াম নিয়ে একটার পর একটা সুর ভেঁজে চলেছে।

বিকাশ এসে বললে, খেতে কিন্তু ভাই, অনেক রাত হবে। আমরাও তাই চাচ্ছিলাম। সবাই ব'লে উঠলাম, **Thank you, that's just what we want.**

অবনী বললে, অনিলের, ভাই, চেঁচিয়ে গলা শুকিয়ে গেছে, ওকে আর এক পেয়ালা চা দাও না।

হাসতে হাসতে বিকাশ বললে, বুঝেছি, শুধু ও বেচারার ওপর দিয়ে কেন? এখুনি চা আসছে।

এই সময়ে প্রকাশদা এসে উপস্থিত হলেন।

কি হে ভায়ারা, খুব যে জমিয়ে নেবার ব্যবস্থা হচ্ছে!

তাঁকে দেখে আমরা সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। অনিল হারমোনিয়াম রেখে স'রে এল, আমরাও তাস গুটিয়ে সব একপাশে জড় হয়ে বসলাম।

প্রকাশদার মেজাজটা সেদিন খুব ভাল ছিল। তিনি বললেন, বলি, ব্যাপার কি? সবাই সুবোধ বালকের মত টিটুপক্ষী হয়ে বসলে যে?

একসঙ্গে সবাই ব'লে উঠলাম, দাদা, আজ একটা ভূতের গল্প বলতেই হবে।

প্রকাশদা বললেন, দেখ হে, ওসব বেশি বলতে নেই, অনেক সময়ে হাল্কা হয়ে যেতে হয়।

প্রকাশদার ভূতের গল্প শুনতে শুনতে কেউ যদি হাসত, তা হ'লে তিনি ভয়ানক চ'টে যেতেন। সেকথা আমাদের জানা ছিল। আমরা বললাম, না দাদা, আমরা খুব বিশ্বাস করি, আজ একটা শোনাতেই হবে।

প্রকাশদা সেদিন সহজেই রাজি হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, দেখ ভায়ারা, আগে থেকে ব'লে নিচ্ছি, কেউ কোন তর্কযুক্তির মধ্যে যেও না, আমিও একদিন প্রেতলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলাম। যেদিন থেকে আমার প্রথম এই ভুল ভাঙে সেই দিনের কথাটা খুব সংক্ষেপে বলছি, শোন।

সবাই সমস্বরে বললাম, আচ্ছা, আচ্ছা।

এই সময়ে চা এল। এক পেয়ালা চায়ের সঙ্গে দুখানি গরম সিঙাড়া গলাধঃকরণ ক'রে সবাই পরম মনোযোগী ছাত্রের ন্যায় প্রকাশদাকে ঘিরে যথাসম্ভব গম্ভীর হয়ে বসলাম।

প্রকাশদা বলতে আরম্ভ করলেন।

সে আজ দশ বছর আগেকার কথা। আমি কেবল কলেজ ছেড়েছি। বাবা বললেন, ওরে, ধূলাউড়ি মহলটায় একবার না গেলে তো চলছে না। আমার শরীরে কুলিয়ে উঠবে না। তুই গিয়ে একটা ব্যবস্থা ক'রে আসতে পারবি?

ধূলাউড়ি বাংলাদেশের এক প্রান্তে, তার ওপর আবার রেল-লাইন থেকে বিশ ত্রিশ মাইল দূরে। নতুন জমিদারি, কৌতূহলও কম ছিল না। বলামাত্রই সম্মত হলাম। স্থানের বিবরণ শুনে বাবা পূর্ব্ব হতেই প্রস্তুত হয়ে যেতে বললেন। খুব সংক্ষেপেই বলছি—

সবাই একসঙ্গে ব'লে উঠলাম, না না, সবটা ভাল ক'রে বলতে হবে।

প্রকাশদা ধমক দিয়ে বললেন, থাম, ও রকম করলে কিছুই বলা হবে না।

সবাই থেমে গেলাম।

প্রকাশদার গল্পের ভঙ্গি ছিল ঠিক নভেলের ধরণে। শুনতে বড়ই ভাল লাগত। তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন—

যা বলি, শোন। ধূলাউড়ি বাণপুর ষ্টেশন থেকে প্রায় পচিশ মাইল। গ্রামে শিক্ষিত লোক প্রায় ছিল না বললেই চলে। বসতি নিতান্ত অল্প নয়। পূর্ব্বের জমিদারের একটা কাছারি এবং একটা ছোটখাট হাটও ছিল। পূর্ব্বে এই ধূলাউড়িতে নীলকর সাহেবের কুঠি ছিল ব'লে গ্রামটা বেশ বিখ্যাত ছিল।

বছর পাঁচেক পরেই মহলটা বাবা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। যাক সে কথা।

কার্ত্তিক মাসের শেষ ভাগ। এক পাচক আর এক চাকর নিয়ে

গোযানে ধূলাউড়িতে উপস্থিত হলাম। হাটের কাছে, প্রাইমারি স্কুলের ময়দানে আমার তাঁবু খাটানো হ'ল। দুদিন সেখানে থাকবার পরেই গ্রামে কলেরা দেখা দিল। রোজ পাঁচ সাত জন ক'রে মানুষ মরতে লাগল আর ব্যাধির প্রকোপও ক্রমে বেড়ে চলল। চারদিকে দিনরাত কান্নার শব্দ! দিনে শিয়ালের হুক্কাহুয়া, রাতে কাকের কা কা, সে এক বীভৎস ব্যাপার! তাঁবুর অনতিদূরেই ঘন বস্তি। কোন বাড়িই এই ব্যাধির হাত থেকে নিস্তার পায় নি। জলাশয় ও পুকুর-গুলোকে শত চেষ্টাতেও বীজাণুশূন্য রাখা গেল না। স্থানত্যাগ ক'রে পাশের কোন গ্রামে যাওয়াও নিরাপদ মনে হ'ল না, কারণ ওই সংক্রামক ব্যাধির বীজ তখন সব গ্রামেই ছড়িয়ে পড়েছে। এত কষ্ট ক'রে গিয়েছি, হঠাৎ ফিরে আসতে ইচ্ছা হ'ল না। বাবাকে কিছু জানালাম না। এই সময়ে একদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বে বেড়াতে বেড়াতে গ্রামের প্রান্তদেশে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছে ঘেরা একটা মস্ত দীঘি দেখতে পেলাম। দীঘির পাড়ে অনেকটা জায়গা বেশ পরিষ্কার ময়দান। চারদিকে বড় বড় ঝাউ অশ্বত্থ আর শিশুগাছ। স্থানটি বিশেষ নির্জ্জন, এবং ওই পুকুরের জলও খুব নির্ম্মল ব'লে মনে হ'ল। মনস্থ করলাম, আর দেরি না ক'রে ওই নিরিবিলি স্থানটিতেই আশ্রয় গ্রহণ করব। স্থানীয় আর একটা চাকর নিয়েছিলাম, তার নাম ছিল রামশরণ। লালবিহারী আর ভক্তরাম তো আগে থেকেই সঙ্গে ছিল। তাঁবুতে ফিরে চা খেতে খেতে তাদের কাছে আমার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। রামশরণ তো আমার কথা শুনেই শিউরে উঠল।

আমি জিজ্ঞাসা করলে সে বলল যে, ওইস্থানে এক নীলকুঠি ছিল। এককালে জায়গাটা শহরের মত গুলজার ছিল। ওই দীঘির জল এত নির্ম্মল জেনেও কেউ ব্যবহার করে না, কারণ এমন একটা ভীতিপ্রদ

স্থান আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। অনেক সাহসী লোক এই স্থানে ভয় পেয়ে ইহলীলা সংবরণ করেছে। গ্রামের বহু লোক এই নীলকুঠিতে অশ্বারোহী ভীষণ কবন্ধমূর্ত্তি স্বচক্ষে দেখেছে। বস্তুত যথেষ্ট প্রমাণ প্রয়োগের পর এই নীলকুঠি বর্ত্তমানে একটা পরিত্যক্ত প্রসিদ্ধ ভূতের আড্ডা ব'লে সাব্যস্ত হয়েছে।

ভৌতিক ব্যাপারে কোন দিনই আমার আস্থা ছিল না, বরং কৌতূহলই ছিল। রামশরণের কথা শুনে আমার সঙ্কল্প আরও দৃঢ় হ'ল। আমি হাসতে হাসতে বললাম, তাতে আর তোর ভয় কি, তুই তো রাত্রে থাকিস না। দিনের বেলায় ভূত বার হয় না।

রামশরণ কোন উত্তর দিল না। তারপর লালবিহারী আর ভক্তরামের মতামত জিজ্ঞাসা করলুম। তাদের মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে পারছিলাম যে তারাও বড় সম্মত নয়। তবে আমার নিতান্ত উৎসাহ দেখে তারা মুখে কোন অমত করল না। বরং লালবিহারী আমাকে ভরসা দিয়ে বললে, কুচ পরোয়া নেই বাবু, হমারা পৈঙা হ্যায়।

যা হোক, পরদিন তাঁবু তুলে নীলকুঠির পুকুরপাড়ে আস্তানা করলাম। স্থানটি বড়ই মনোরম, বড়ই নির্জ্জন। উন্মুক্ত প্রান্তরের নির্ম্মল বাতাস ঝাউগাছের মধ্য দিয়ে সরসর শব্দে সর্ব্বদাই প্রবাহিত আর দীঘির জলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিবিক্ষেপ—ইচ্ছা হ'ত ক্যামেরা আর কথা দিয়ে জায়গাটার ছবি এঁকে রাখি।

বন্দুক নিয়ে শীকার করতে বেরিয়েছিলাম। সন্ধ্যার সময়ে ফিরে এসে দেখি, লালবিহারী কম্বল মুড়ি দিয়ে প'ড়ে চেঁচাচ্ছে, আর ভক্তরাম মাথায় পাগড়ি বেঁধে বিমর্ষভাবে ব'সে আছে। রামশরণ বললে, বাবু, গরিব মানুষ, বেশি কথা বলতে ভয় হয়। এখনও সময় আছে। চলুন, আজ রাত্রের মত কাছারি-বাড়িতে থাকবেন। কাল সকালে

জায়গা-ঠাঁই দেখে যা হয় ব্যবস্থা করলে হবে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম, দুপুরের পরেই লালবিহারীর বিষম জ্বর এসেছে। জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই নানা রকম ভুল বকছে। ভক্তরামেরও মাথায় বেদনা। কাছারির নায়েব দুই চার জন মাতব্বর প্রজাসহ দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁরাও এই স্থান সম্বন্ধে নানা প্রকার উৎকট কিংবদন্তী এবং প্রত্যক্ষ ইতিহাসের বর্ণনা ক'রে আমাকে স্থানান্তরে যাবার পরামর্শ দিতে লাগলেন। তাঁদের কথায় আমার জিদ যেন আরও বেড়ে গেল, আমি ওই নীলকুঠিতেই থাকতে কৃতসংকল্প হলাম। এই সময়ে লালবিহারী দুই হাতে পৈতা চেপে ধ'রে 'রাম রাম' ব'লে চীৎকার ক'রে উঠল। আমি ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কি ঠাকুর, ব্যাপার কি ?

আরে নেহি নেহি বাবু সাব, এ জায়গা আচ্ছা নেহি হ্যায়। আঁখ মুদ্‌লেছে বিলকুল্ ঝুটা দেখতা হ্যায়। এহি দানাপুরীমে হাম কভি রহেগা নেহি। ভক্তরামের মুখও দেখলাম শুকিয়ে গেছে। সেও রাত্রে সেখানে থাকতে রাজি হ'ল না। আমি বিরক্ত হয়ে বললাম, তোমরা সব কাছারিতে যাও, আমি একাই থাকব। আজ রাত্রে যদি আমি ভূতের হাতে না মরি, তবে কাল থেকে তোমাদেরও থাকতে হবে। আমার অনুমতি পাওয়া মাত্রই লালবিহারী ঠকঠক ক'রে কাঁপতে কাঁপতে উঠে লোটা কম্বল আর লাঠিটা হাতে ক'রে ভক্তরামের সঙ্গে কাছারির দিকে রওনা হ'ল। যাবার সময়ে আমার মঙ্গল কামনা ক'রে সেই রাতটার মত আমাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা ক'রে গেল। নায়েব ও অন্যান্য লোকদের বিস্তর অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়ায় তাঁরাও নিতান্ত বিষণ্ণভাবে, জীবিত অবস্থায় আমার সঙ্গে তাদের পুনরায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিলক্ষণ সন্দেহ নিয়েই একে একে

বিদায় নিলেন। নায়েব মশাইয়ের বিশেষ অনুরোধে এবং বাধ্য হয়ে কাছারি থেকে কিছু আহার্য্য গ্রহণ করতে সম্মত হলাম। রামশরণ আমার অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি গুছিয়ে রেখে প্রণাম ক'রে রাত্রির মত বিদায় হয়ে গেল। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

সবাই চ'লে গেলে আমি বন্দুকটিতে বেশ ক'রে গুলি ভ'রে বিছানায় রেখে দিলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, সত্যই কি শেষে নিশুতি রাত্রে কবন্ধমূর্ত্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে নাকি! পাঁচ জনের কথায় মনটা যা একটু বিচলিত হয়েছিল অনেক ভেবে তা দৃঢ় ক'রে নিলাম। এমনই যদি কিছু থাকে তাতেই বা ভয় কি? অযথা আমার উপর একটা অত্যাচার করবার কি কারণ থাকতে পারে? আর করতে এলেও গুলি না ক'রে ছাড়ব না। শব্দ এবং অগ্নি দুইই ভগবানের শক্তি। মানুষের দেহেও ভগবান বিরাজিত। বস্তুত, বন্দুকের উপরেই আমার নির্ভরতা বেশি। পাঁচ সাত ভেবে শেষে একখানা ইংরেজী নভেল নিয়ে পড়তে বসলাম।

রাত প্রায় দশটার সময়ে কাছারি থেকে পাঁড়ে ঠাকুর দুইজন লোক সঙ্গে ক'রে আমার আহার্য্য দিয়ে গেল। যাবার সময়ে তারা পরস্পর যা বলাবলি করতে করতে গেল, তার দু একটা কথা আমার কানে পৌঁছেছিল। তা কিন্তু আদৌ সুখকর নয়। তারা চ'লে গেলে রাত্রের মত আর কোন মানুষের সমাগম হবে না ভেবে মনটা কিছু দমে গেল বটে, কিন্তু ভয় সাহসের মাত্রা অতিক্রম করল না। মনে করলাম, এখুনি শুয়ে পড়ব। ঘুম আমার বরাবরই খুব গাঢ়। একবার ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই রাত শেষ। ভূত তো নাই-ই, আর থাকলেও তাঁবুর ভিতর ঢুকে ঘুমন্ত মানুষের উপর খামকা সে জুলুম করবে কেন?

তৎক্ষণাৎ আহার শেষ ক'রে নিলাম। তাঁবুর রশি বেশ শক্ত ক'রে

বাঁধতে বাঁধতে দেখলাম ক্ষীণ জোছনার মৃদু আলোকে সমস্ত প্রাঙ্গণটা পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে বিশাল গাছগুলির ছায়া প'ড়ে আলো আর আঁধারে যেন জড়াজড়ি ক'রে রয়েছে। দীঘির কালো জলে স্থানে স্থানে চাঁদের আলো ছড়িয়ে প'ড়ে চকচক করছে। ঝাউ-গাছের মধ্য দিয়ে সাঁ সাঁ শব্দে বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে। চারদিকে একটা বিরাট নিস্তব্ধতা। ভয়ের কথা ভুলে গেলাম। সে যেন স্বপ্নরাজ্যের একটা ঘুমন্ত পুরী! ইট-বার-করা ঘাটের সিঁড়ির উপর যেন কিসের একটা ছায়া পড়ল! নারীমূর্ত্তি? ভয়, বিস্ময় ও কৌতূহল একসঙ্গে আমায় অভিভূত ক'রে ফেলল। ধোঁয়াটে মেঘের ফাঁক দিয়ে এক টুকরো চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ল। সত্যই তো! শরীরের প্রতিটি অঙ্গের পূর্ণতা নিয়ে সে যেন বিজয়গর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে! চোখ ঝাপসা হয়ে এল, আর সঙ্গে সঙ্গে এক দল শিয়াল চীৎকার ক'রে ডেকে উঠল। একটা ঝাঁকি খেয়ে পিছিয়ে গেলাম। পরক্ষণেই তাড়াতাড়ি তাঁবুর দরজা বেঁধে বন্দুকটিকে পাশে রেখে আলোটাকে খুব জোর ক'রে দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

পাথরের পুতুলের মত আমরা অসাড় হয়ে গল্প শুনছিলাম। বিনয় জানলার কাছে ব'সে ছিল। সে আস্তে স'রে গিয়ে খোলা কবাটটা বন্ধ ক'রে দিল।

শ্রোতাদের বিশ্বস্ততা দেখে প্রকাশদার উৎসাহ বেড়ে গিয়েছিল। তিনি ব'লেই চললেন—

ভাবতে চেষ্টা করলাম ওটা কিছুই নয়, একটা মনের বিকার, যেমন ছেলেবেলায় গল্প শুনে হ'ত। কিন্তু নিদ্রাদেবী সেদিন আর আমার প্রতি সদয়া হলেন না। শত সাধ্য-সাধনাতেও ঘুম এল না। কেবলই রামশরণের বর্ণনা, লালবিহারীর আকস্মিক পীড়া আর ভীতিপ্রদ

জনপ্রবাদ ঘুরে ফিরে মনে আসতে লাগল। শত চেষ্টাতেও সে চিন্তার গতি অন্য দিকে ফেরাতে পারলাম না। সেই নির্জ্জন জনসমাগমশূন্য বহুকালের নীলকুঠির প্রাঙ্গণে নিঝুম রাত্রিতে নিজেকে বড়ই নিঃসহায় মনে হতে লাগল। কত প্রকারের সৎচিন্তা, কত কত সাহসী মহাপুরুষদের জীবনী স্মরণ ক'রে চিত্তে সাহস আনবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ভগ্ন নীলকুঠির ভিতরে ঝিল্লিধ্বনি মাঝে মাঝে সেই গভীর নিস্তব্ধতা ভেঙে দিচ্ছিল। বহুকষ্টে একটু তন্দ্রাবেশ হয়েছে, এমন সময়ে এক আচম্বিত কান্নার শব্দে সজাগ হয়ে উঠলাম। বুঝলাম, কোন হতভাগ্য ইহলীলা সংবরণ করেছে। তন্দ্রাবেশ একদম ছুটে গেল, ঘুম আর কিছুতেই আসে না। মনে হতে লাগল, এই যে কত লোকের জীবলীলা অবসান হচ্ছে, এদের আত্মা তো অশরীরী অবস্থায় বিচরণ করছে। কবন্ধ-প্রেতের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। এই সব মৃতের আত্মা যদি এই নির্জ্জনে সহসা আবির্ভূত হয়! দূর হোক ছাই, এসব কি ভাবছি! মনে মনে নানা সাধুবাক্য নানা স্তোত্র উচ্চারণ করতে লাগলাম। সহসা তাঁবুর বাইরে ধুপ ধুপ অশ্বপদধ্বনি শোনা গেল। চিত্তের ধৈর্য্য একেবারেই ভেঙে যাবার উপক্রম হ'ল। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলাম। মনে হ'ল, কে যেন ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে। সর্ব্বনাশ! কবন্ধ-মূর্ত্তি নিশ্চয়ই অশ্বপৃষ্ঠে বিচরণ করছে। এতক্ষণে কৃতনিশ্চয় হলাম যে আমি আদৌ নিরাপদ নই। কুঠিওয়ালার এলাকায় তাঁবু খাটিয়ে আলো জ্বালিয়ে এই অনধিকার প্রবেশের জন্য আমাকে অচিরাৎ কৈফিয়ৎ দিতে হবে। সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিল। ওই, আবার ধুপ—ধুপ—ধুপ! আরও কাছে! কি সর্ব্বনাশ! চীৎকার করব? না না, তাতে বিপদ বাড়বে বই কমবে না। আর নিস্তার

নেই। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, রাত মাত্র দেড়টা। ওঃ, এখনও প্রভাত হতে অনেক দেরি। ভগবান, আজকার রাতটার মত আমাকে রক্ষা কর। এই প্রবাসে ঘোর নির্জ্জন প্রান্তরে কবন্ধ-প্রেতের আক্রমণ হতে আমাকে বাঁচাও। বক্ষের স্পন্দন তখন অতীব দ্রুত। সাহসে ভর ক'রে বন্দুকটা তুলে নিলাম। বিছানার উপর উঠে বসলাম। অসহায় শায়িত অবস্থায় ভূতে আমাকে ঠেসে মারবে, তা হবে না। কিন্তু একি! হাত কাঁপে কেন? মাথাটা যেন ঝিমঝিম করছে! শরীরটাকে একটা ঝাড়া দিয়ে বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালাম। দেহের সমস্ত শক্তি যেন ঘামের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছিল। ওই, আবার শব্দ! একেবারে তাঁবুর কাছে! আর রক্ষা নেই! প্রাণের মমতা তখন একরকম ছেড়ে দিয়েছি। মরিয়া হয়ে সাহস সঞ্চয় করলাম। সজোরে ডান হাতে বন্দুক ধ'রে বাঁ হাতে তাঁবুর প্রবেশ-পথ ঈষৎ উন্মুক্ত ক'রে বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলাম। চন্দ্রদেব অস্তমিতপ্রায়। অতি ক্ষীণ জোছনার আলো গাছের ফাঁকে ফাঁকে তখনও ছড়িয়ে রয়েছে। জগৎ-সংসার নিস্পন্দ। মৃদু আলোকে গাছগুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দৈত্য-সৈন্যের মত মনে হতে লাগল। কিন্তু অন্য কিছু দেখতে পেলাম না। মনে একটু সাহস হ'ল। আবরণ আরও খানিকটা অপসৃত করলাম। কই, কিছুই তো নেই। ওই, ওই আবার! টগবগ টগবগ! শব্দ তো নয়, যেন মৃত্যুদূতের আহ্বান! আবার চারদিক নীরব নিঝুম। না, আর না। এইবার বিপরীত দিকে ছুটে পালাই। হৃদ্‌স্পন্দন বন্ধ হয়ে যাবে নাকি! উন্মত্তের মত তাঁবুর বাঁধন খুলে ফেলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু একি হ'ল, নড়তে পারি না যে! ওঃ, চোখের সামনে কি বিভীষিকা! প্রকাণ্ড ঘোড়ার পিঠে ও কিসের বীভৎস মূর্ত্তি! কবন্ধের সঙ্গে সঙ্গে শূন্যের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে একটা

রক্তমাখা ছিন্ন মুণ্ড! নিশ্বাস বন্ধ ক'রে বন্দুক তুলে ধরলাম। মুহূর্ত্তের জন্য সমস্ত সাহস ও শক্তি ফিরিয়ে এনে সেই মূর্ত্তি লক্ষ্য ক'রে ঘোড়া টিপলাম। বিরাট নৈশ নিস্তব্ধতা বিদীর্ণ ক'রে গুড়ুম শব্দে বন্দুক গর্জ্জন ক'রে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আমি আত্মহারা হয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে লোকালয়ের দিকে ছুটলাম। কত দূর পৌঁছেছিলাম জানি না; যখন জ্ঞান হ'ল তখন চেয়ে দেখি, আমার চারিদিকে মানুষ।

প্রকৃতিস্থ হয়ে পরদিন বুড়ো মণ্ডলের কাছে যা শুনলাম তার সঙ্গে ওই ভৌতিক ব্যাপারের অপূর্ব্ব সামঞ্জস্য দেখে বিস্মিত হয়ে গেলাম। সে আজ দশ বছর আগেকার ঘটনা। তোমরা যে যাই বল, আমি এত ভীরু ছিলাম না যে মানসিক উত্তেজনার বশে কতকগুলি ভৌতিক মূর্ত্তি কল্পনা ক'রে নিয়ে মন্নতে বসেছিলাম। এ জিনিসটা তখন আমার কাছে মস্ত বড় প্রহেলিকা ছিল বটে, কিন্তু এখন স্থূল প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গল্প শুনতে শুনতে আমরা তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। সেই কবন্ধের বিকট মূর্ত্তি আমাদের চোখের সামনে ভাসছিল।

বিনয় যেন বড় দমে গিয়েছিল। সে জিজ্ঞাসা করলে, যা বললেন সব সত্যি?

প্রকাশদা উত্তেজিত হয়ে উত্তর করলেন, সন্দেহ করছ? অণুমাত্রও সন্দেহ ক'র না। প্রেতলোক ধ্রুব সত্য। যেমন তুমি আমি সত্য, তেমনই আত্মিকের অস্তিত্বও সত্য। ভূতলোক এখন অকাট্যভাবে প্রমাণিত, হিন্দুশাস্ত্র নির্ভুল। জীবজগত হ'তে সম্বন্ধচ্যুত হয়ে অশরীরী আত্মিককে এই দ্বিতীয় স্তরেই তার দেহধারী জীবনের কৃতকর্ম্মের জন্য কৈফিয়ৎ দিতে হয়। স্তরে স্তরে সপ্তলোক। সে বুঝবে না তোমরা। তবে ভয় পেও না কেউ, ভগবানে বিশ্বাস রেখ। এ পৃথিবী

ছাড়াও অনেক কিছু আছে। কর্ম্মফল কেউ এড়াতে পারে না, যুগ যুগান্তরের মধ্য দিয়ে মহাকালের তাণ্ডবলীলা—বৈচিত্র্যময় পরিবর্ত্তন, শুধু আশ্রয় ছেড়ে আশ্রয়ান্তর। অতৃপ্ত কামনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ অদেহী—

আমরা স্তম্ভিত হয়ে প্রকাশদার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। বাইরে তখন বাতাসও খুব জোর বইছে; আর টিপটিপে বৃষ্টি আর ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার।

বেকার

সতেরটি টাকা সম্বল ক'রে নলিন এসেছিল কলকাতায়। একমাস কেটে গেছে একশো ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে ; দ্বারে দ্বারে কেবল লাঞ্ছনা আর অপমান। একটা আপিস থেকে দেখা করবার জন্য চিঠি পেয়েছিল সে। বড় একটা আশা নিয়েই আপিসের দরজা অবধিও পৌঁছেছিল, কিন্তু দারোয়ানের তাড়া খেয়েই তাকে ফিরে আসতে হয়েছে। দুশো উমেদার। দারোয়ানকে যারা নজর দিতে পেরেছিল প্রবেশাধিকার পেয়েছিল শুধু তারাই। সতেরটি পয়সা ছিল তার পুঁজি, তাতে কুলাল না। একবেলা ঝাঁ ঝাঁ রোদে হতাশ চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এল সে একবুক পিপাসা নিয়ে। একটা ওষুধের দোকানে নাকি দু-একজন লোক নিচ্ছিল। খবর পেয়েই ছুটে গেল সে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে। ছোট দোকান, দারোয়ান ছিল না। সে সরাসরি ভিতরে ঢুকে পড়ল। দোকানের কর্ত্তা একখানা চেয়ারে ব'সে ছিলেন। সামনে একটা টেবিল। তাঁর ওপাশে একজন ভদ্রলোক অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর রকম দেখেই বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি একজন উমেদার। নলিনকে ঢুকতে দেখে কর্ত্তা ভ্রূ কুঁচকে একটা বিশ্রী মুখের ভাব ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হে, তুমি আবার কি চাও? নেহাৎ সঙ্কুচিতভাবে একটা নমস্কার ক'রে নলিন তার আবেদন জানাতে যাচ্ছিল, তাকে বাধা দিয়ে কর্ত্তা বললেন, কথা যা তা বুঝেছি, দাঁড়াও আগে।—ব'লেই তিনি আগেকার

ভদ্রলোকটির দিকে ফিরে অসম্ভব গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বললেন, তারপর বলুন, কি বলছিলেন ?

আজ্ঞে, আমি বর্ত্তমানে মাইনে চাই না, শুধু নিজের খেয়ে কিছু কাজকর্ম্ম শিখতে চাই।

ভবিষ্যতের আশায় ? বটে, কি পড়েছেন আপনি ?

গত বছর বি. এস-সি. পাস করেছি।

পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট দুটিকে যথাসম্ভব বাঁকা ক'রে কর্ত্তা বললেন, কিন্তু আপনার কোয়ালিফিকেশনে এখানে শিশি-বোতল ধোয়া ছাড়া আর কোন কাজ পাবেন না।

ভদ্রলোকের মুখখানা ছাইয়ের মত সাদা হয়ে গেল। অনেক কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে তিনি বললেন, আপনি উপহাস করছেন না তো ?

রূঢ়স্বরে উত্তর এল, উপহাস নয় মশায়, এখানে তিনজন এম. এস-সি. আন্‌পেড এপ্রেণ্টিস রয়েছে। কাজেই বি. এস-সি.কে আর কি কাজ দিতে পারি, বলুন ?

উমেদার ভদ্রলোকটি দুঃখে লজ্জায় মাটিতে মিশে যাচ্ছিলেন। তাঁর অবস্থা দেখে অতি-বড় নিষ্ঠুরেরও দয়া হয়, কিন্তু কর্ত্তা মুচকি হেসে সেই অবস্থাটা বেশ উপভোগ করছিলেন। সহানুভূতিতে নলিনের হৃদয় ভ'রে গেল। সে যে তার চেয়েও হতভাগ্য, অক্ষম। রূঢ়তর কিছু শোনবার আগে নলিন স'রে পড়বার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। তার সেই ভাব লক্ষ্য ক'রে মালিক বললেন, কি হে, শুনলে তো, নতুন কিছু বলবে নাকি ?

না মশায়, ধন্যবাদ।—ব'লেই একটা শুষ্ক নমস্কার জানিয়ে নলিন ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় এসে সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল। তারপর অবসন্ন চিত্তে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে

সে তার বাসার দিকে চলল। বাসা মানে একটা মেস—বালি-খসা, স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার একটা বাড়ি। তার অধিবাসী স্বল্প বেতনের কয়েকজন চাকুরে, একটা উড়ে বামুন আর একজন ঝি। সামনে তার বারোমাস একখানি বিজ্ঞাপন ঝুলানো থাকে—'মেম্বর চাই'।

নলিন মেসে ঢুকতেই ম্যানেজার চীৎকার ক'রে ব'লে উঠলেন, এরকম করলে তো চলবে না মশায়। আপনার কাছে সাড়ে তিন টাকা পাওনা হয়েছে। কেবল তো খেয়েই যাচ্ছেন, রসদ জোগায় কে? আজ টাকা না দিলে আর খেতে পাবেন না।

হতভম্ব হয়ে নলিন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে বললে, আমাকে আর চারটি দিনের সময় দিন, এর মধ্যে আপনাদের পাওনা চুকিয়ে দোব।

ম্যানেজার স্বরের মাত্রা আর একটু চড়িয়ে বললেন, আর চার দিনে তো পাওনা আরও বেড়ে যাবে, এর মধ্যে যদি তোমার জমিদারি থেকে টাকার চালান এসে না পৌঁছয়, তা হ'লে কি করবে শুনি? রাতারাতি পালাবে তো? তোমার নেইও তো কিছু যে তাই ধ'রে টাকা আদায় করব। সে হবে না মশায়, কে তোমাকে ব'সে ব'সে খাওয়াবে?

কাকুতি ক'রে নলিন বললে, দয়া ক'রে চারটি দিন অপেক্ষা করুন, আপনাদের টাকা না দিয়ে আমি পালাব না।

আরও কতকগুলি কটু উক্তির পর অনন্যোপায় হয়ে ম্যানেজার তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর ক'রে বিদায় হলেন।

নলিন চোরের মত তার অন্ধকার ঘরখানিতে ঢুকে মায়ের হাতের সেলাই করা পুরোনো কাপড় দিয়ে জোড়া মলিন কাঁথাখানির উপর প'ড়ে ওয়াড়শূন্য জীর্ণ বালিশটিকে দুহাতে জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে ফেললে। কোথা থেকে টাকা দেবে সে? স্ত্রীর দুগাছি বাঁধানো চুড়ি বন্ধক রেখে

সতেরটি টাকা নিয়ে সে বেরিয়েছে আজ এক মাসের উপর, এই চাকুরির চেষ্টায়। বাড়িতে রুগ্না মা, যুবতী স্ত্রী আর এক অবিবাহিতা ভগ্নী অনশনে বা বড়জোর অর্দ্ধাশনে দিন কাটাচ্ছে তারই মুখ চেয়ে। স্ত্রীর সম্বলের মধ্যে ছিল দুগাছি চুড়ি আর দুটি দুল। চুড়ি দুগাছি খুলে দেবার সময় শুভা হাসিমুখে বলেছিল, দুঃখ করছ কেন, চাকরি হ'লে আবার গড়িয়ে দিও। হায় আশা! আজ কোন্ মুখে সে এই বিফলতা নিয়ে রিক্ত হস্তে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে! কেমন ক'রে সে এই মেসের দেনা শোধ করবে! বাড়ি ফেরবার পাথেয়ও তো তার নেই। কিছুক্ষণ চোখের জল প'ড়ে প'ড়ে বুকখানি যখন তার হাল্কা হয়ে এল তখন সে শরীরটাকে একটা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ল। শুভাকে একখানি চিঠি লিখল, "মাকে ব'লে তোমার দুলদুটি বাঁধা রেখে যে কটি টাকা পাও পত্রপাঠ পাঠিয়ে দিও। কবে ফিরব ঠিক নেই। আশা করি তোমরা ভাল আছ। খুব সাবধানে থেকো।"—চিঠিখানি লিখেই সে পোষ্ট-আপিসে রওনা হবার জন্য উঠে দাঁড়াল।

তার পাশের ঘরের বোর্ডার যুবকটি অনেকক্ষণ ধ'রে ভাঙা জানলার ফাঁক দিয়ে তাকে লক্ষ্য করছিল। নলিন বেরিয়ে পড়ার আগেই সে তার ঘরে ঢুকে বিছানার উপর ব'সে পড়ল। নলিন বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাতেই সে বললে, কিছু মনে ক'র না ভাই, তোমার অবস্থা দেখে দুটো কথা বলতে এলাম।

নলিন বললে, কি, বলুন?

বলছি যে সামান্য একটা গোলামির জন্যে কি প্রাণপাতই না করছ! আর তাও যদি বা কখনও মেলে তাতে কি পেট ভরবে?

না ক'রে কি করি বলুন?

যুবকটি উত্তেজিত অথচ চাপাস্বরে উত্তর দিল, কি করবে? কি

করবে ? স'রে এস, বলছি।—নলিনকে টেনে কাছে এনে সে অত্যন্ত নিম্নস্বরে বক্তৃতা করতে লাগল। মাঝে মাঝে তার হাতের মুষ্টি দৃঢ় হয়ে শিরাগুলি পর্য্যন্ত ফুলে উঠছিল।

তাহার কথা শেষ হ'লে নলিন বললে, মাফ কর ভাই, না খেয়ে ম'রে গেলেও—

. তাকে বাধা দিয়ে ক্রুদ্ধস্বরে যুবকটি ব'লে উঠল, তোমরা কি মানুষ ? কুকুরের মত দ্বারে দ্বারে পেটের দায়ে ঘুরে মরছ, এই দাস্য-মনোবৃত্তি নিয়ে জগতের কি কোথাও স্থান পাবে ?

নলিনের সমস্ত গা শিউরে উঠল। সে একটা ভয়ানক অসাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বললে, না না, ওসব বলবেন না আপনি। আমি এখন বাইরে যাচ্ছি, আপনি আপনার ঘরে যান।

যুবকটি উঠে যেতে যেতে বললে, বুঝেছি, এখনও একটু দেরি আছে আপনার, তবে সময়ে ঠিক হবে।

ডাক-বাক্সে চিঠিখানি ফেলে দিয়ে নলিন উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তা ধ'রে চলল। মাথার মধ্যে তার বিশ্ব-সংসারের চিন্তা বাসা বেঁধেছিল। এই যে লক্ষপতিদের হাজার হাজার মোটর আর গাড়ি ছুটে চলেছে রাজপথ দিয়ে উদ্দাম বিলাসিতার বিজয়শঙ্খ বাজিয়ে, এই যে প্রাসাদোপম বাড়িগুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে ঐশ্বর্য্যের সগর্ব্ব নিশান উড়িয়ে, একি শুধু নিরন্ন হতভাগ্যদের উপহাস করবার জন্য ! এদের অনেকের একদিনের বিলাসিতার ব্যয় একটা অনশনক্লিষ্ট পরিবারকে হয়তো এক বছর বাঁচিয়ে রাখতে পারে। হায় ধনী, আমরাও তো মানুষ। আমাদেরও তো মা আছে, পুত্র আছে, স্ত্রী আছে। আমাদেরও স্ত্রীদের মনে সংসার-সুখের কত কল্পনা, ছেলেদের মনে কত কৌতূহল—কত রঙিন স্বপ্ন, মায়েদের মনে কত আশা।

বাঃ, ছোটখাটো কি সুন্দর ছবির মত বাড়িখানি! যদি আমার হ'ত! ওই যে গ্যারেজে একখানা চকচকে মোটর রয়েছে, ওই মোটরে শুভাকে নিয়ে যদি ময়দানে হাওয়া খেয়ে বেড়াতে পারতাম, তা হ'লে শুভার হাসিভরা মুখখানির দিকে চাইলে কি আনন্দেই না আমার হৃদয় ভ'রে উঠত!

যত রাজ্যের উৎকট কল্পনা তার মনে জেগে উঠছিল। ওই যে মস্ত ওয়েলার-জোতা সুদৃশ্য গাড়িখানা ছুটে চলেছে এক তরুণীকে বহন করে, ওখানা যদি এখন কোন কিছুতে লেগে উল্টে যায়, আর ওই আরোহিণীকে যদি আমিই বিপদ থেকে বাঁচাতে পারি, তবে হয়তো ওই একমাত্র কন্যার পিতা কৃতজ্ঞতাবশে আমাকে তাঁর অর্দ্ধেক রাজ্য আর—না না, ছি ছি! কি পাষণ্ড আমি! শুভা যে আমার পথ চেয়ে ব'সে আছে।

বিদায়কালে শুভার সেই ডাগর ডাগর ছলছলে চোখদুটি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল।

হেঁটেই চলল সে আবোল-তাবোল ভাবনা ভাবতে ভাবতে। ক্রমে সে গঙ্গার ধারে এসে উপস্থিত হ'ল। একটা ফুটফুটে ছেলে ঘাটের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে ছিল। নলিন ভাবল, ছেলেটি যদি কোন গতিকে জলে প'ড়ে যায়, তা হ'লে সবচেয়ে আগে আমিই ঝাঁপিয়ে পড়ি তাকে উদ্ধার করতে। ওর বাপ মা নিশ্চয়ই খুব বড়লোক। তাদের অনুগ্রহে অন্তত একটা ভাল চাকরি যদি পাই, বাড়ি গিয়ে হাসিমুখে শুভার সামনে দাঁড়াতে পারি, মার পায়ের ধূলো নিতে পারি।

একটা ছেড়ে একটা, তারপর আর একটা, চিন্তার আর বিরাম নেই। আচ্ছা, ওই যে সাধুটি চোখ বুজে ব'সে আছে, ও কি ইচ্ছা করলে আমাকে আলাউদ্দিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের মত একটা কিছু দিতে পারে না?

ওর পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে একবার চেয়েই দেখি না। নাঃ, ওসব কিছু নয়, তা হ'লে ওই বা ভিক্ষা করে কেন? তার চেয়ে, পথে যেতে যেতে যদি একতাড়া নোট কুড়িয়ে পাই। এমনও তো কেউ কেউ পেয়েছে শোনা গেছে।—এই কথা মনে আসতেই কিছুক্ষণ রাস্তার দিকে চেয়ে চেয়ে চলল সে। ক্রমে সন্ধ্যা অতীত হয়ে গেল। সে তখন ক্ষুণ্ণ-মনে তার সেই নিরানন্দ অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে ঘরখানির উদ্দেশে রওনা হ'ল।

রাত্রি বারোটা। মেস নিস্তব্ধ। নলিনের চোখে ঘুম নেই। কোথায় যাবে, কার কাছে গেলে সে তার মা বোন আর স্ত্রীর দুটি অন্নের সংস্থান করতে পারবে, এই চিন্তা তাকে ভূতের মত পেয়ে বসেছিল। একটা দুটো বেজে বেজে রাত যখন প্রায় শেষ হয়ে এল, তখন তার অবসন্ন চোখের পাতা দুটি আস্তে আস্তে বুজে এল। কি সুখের এই নিদ্রার অবকাশটুকু! এই অবকাশেই বুঝি নিদ্রা মানুষের ভাঙা জর্জ্জরিত দেহের ও মনের কলকব্জাগুলিকে মেরামত ক'রে দেয় আরও আঘাত সইবার জন্য।

সহস্র লাঞ্ছনা, সহস্র নিগ্রহ, সহস্র যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে চার দিন আরও কেটে গেল। আজ মেসের টাকা দেবার দিন। কতক্ষণে পিওন আসবে, আজ টাকা না পেলে যে তার রক্ষা নেই! যদি ভুলের বিনিময়ে কোথাও তারা টাকা না পেয়ে থাকে, তবে? না, নিশ্চয়ই আজ টাকা আসবে। মাকে লিখেছি, শুভাকে লিখেছি। তারা আমার জন্য বুক চিরে রক্ত দিতে পারে, যেমন ক'রে হোক টাকা পাঠাবে। দশটা বেজে গেল। কিছুক্ষণ পরে পিওনও দেখা দিল।

নলিনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে আছেন?

সোৎসাহে এগিয়ে গিয়ে নলিন বললে, আমি, আমি। আমার নামে টাকা আছে ?

হ্যাঁ, সাত টাকা, কিন্তু সাক্ষী লাগবে।

একখানি চিঠিও ছিল, সেখানি পিওন নলিনের হাতে দিল। তাকে সঙ্গে ক'রে নলিন ম্যানেজারবাবুর ঘরে ঢুকল। পিওন টাকা কটি গুণে ম্যানেজারবাবুর টেবিলের ওপর রেখে দস্তখত নিয়ে চলে গেল। ম্যানেজারবাবু টাকা কটি তুলে নিয়ে একটি টাকা নলিনকে দিয়ে বললে, আজ এবেলা পর্যান্ত মেসের পাওনা কেটে নিলাম। এখন তুমি অন্যত্র ব্যবস্থা কর। এখানে আমরা তোমার মত বোর্ডার রাখব না।

নলিনের মাথা ঘুরছিল। কোথায় যাবে সে ? কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে থাকবার মত অবস্থাও তার নেই। দুখানি মাত্র পুরোনো কাপড় আর একটা ছিটের জামা, আসবার সময় শুভা ক্ষার দিয়ে কেচে দিয়েছিল। কাপড় একখানা তো একেবারেই ছিঁড়ে গেছে। আর একখানির দশাও প্রায় তাই। সেইখানাই তার পরনে ছিল। নজর ক'রে দেখলে, জায়গায় জায়গায় ফেঁসে গেছে, আর কি বিশ্রী ময়লা! সাবান ঘসা তো দূরের কথা, থুপিয়ে কাচতেও তো সাহস হয় না, বুঝি বা একেবারেই গ'লে যায় !

নলিনকে পাগলের মত অন্যমনস্ক দেখে ম্যানেজারবাবু বললেন, তোমার মাথায়ও বোধ হয় বেশ একটু ছিট আছে। স'রে পড় বাবা, আজ রাতে আর এখানে কিছু জুটছে না। দিন থাকতে থাকতে অন্য জায়গা দেখে নাও।

নলিনের কথা বলার ক্ষমতা ছিল না। অতিকষ্টে সে বললে, আমার কাছে আর আপনাদের কিছু তো বাকি নেই। যদিও আমার

পোষাকপরিচ্ছদ বড্ড ময়লা হয়ে পড়েছে, তবুও আমি ভদ্রলোকের ছেলে তো বটে। খেতে না দেন, দু-একদিন থাকতে পাব তো?

এবার বাকি পড়লে আর আদায় হবে না, ম্যানেজার তা বেশ বুঝেছিলেন। তবু, নলিনের মুখের দিকে চেয়ে তাঁর কিছু দয়া হ'ল। তিনি বললেন, তা যদি অন্য কোন মেম্বর না আসে তবে সে কথা—

চিঠিখানি আর টাকাটি হাতে ক'রে নলিন তার ঘরে এসে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। খানিক সামলে নিয়ে সে চিঠিখানি খুলে ফেলল। শুভা লিখেছে, "তোমার জন্য বড় ভাবনায় আছি। শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখছ তো? কোথাও কি কিছুর যোগাড় হ'ল না? তোমার কথা ভেবে আমার কান্না পাচ্ছে। এ অবস্থায় আমরাও যে আর থাকতে পারছি না। অনেক চেষ্টা ক'রে দুল দুটি আট টাকায় বিক্রি করেছি। একটি টাকা আমাদের জন্যে রেখে সাত টাকা পাঠালাম। তাও রাখতাম না, কিন্তু রুগ্ন মাকে তো বাঁচাতে হবে। আমাদের জন্য ভেব না। আমরা মেয়েমানুষ, দু-চারদিন না খেলে মরব না।" না, আর পড়া যায় না। কপালে হাত ঠেকিয়ে আপন মনে নলিন ব'লে ফেললে, এই আমার প্রেমপত্র! তার তরুণ জীবনের সমস্তটুকু মধুরতা বুঝি চোখের জলে লবণাক্ত হয়ে গেছে। হায় শুভা, কত তপস্যা ক'রেই না আমার মত স্বামী পেয়েছিলে!

টাকাটি হাতে নিতে তার হাত পুড়ে যাচ্ছিল। এ যেন একখণ্ড টকটকে গরম কয়লা। শুভার মলিন বিষাদক্লিষ্ট মুখখানি তার চোখের সামনে ফুটে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে নিরাভরণ তুলতুলে কান দুটি। কত স্নেহ, কত ভালবাসা ওরা ভ'রে রেখেছে ওই নরম বুকের ভিতর! সহানুভূতির এই প্রতিযোগিতা বড় মিষ্টি, কিন্তু বড়ই মর্ম্মভেদী।

কাপড় একখানা না কিনলেই নয়। নলিন এক টাকার বাজেট ক'রে

ফেললে। সতেরো পয়সা আগেই ফুরিয়ে গেছে। কাপড় দশ আনা, চিঠি লেখার খরচ দু আনা, আর বাকি থাকে চার আনা। এই চার আনাতে চার দিন আরও চলবে, দরকার হ'লে পাঁচ দিনও থাকা যাবে। দু দিন পাইস-হোটেলে একবেলা পাঁচ পয়সা ক'রে দশ পয়সা, আর তিন দিন রোজ একখানা ক'রে দু পয়সার পাউরুটি। এতেই দেহটা খাড়া থাকবে। না খেয়েও তো দু-চারদিন মানুষ বাঁচে। যার মা বোন স্ত্রী না খেয়ে শুকিয়ে মরছে তার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট। চমৎকার বাজেট! নলিন আপন মনে পাগলের মত খানিক হাসল।

দয়া নেই, পৃথিবীতে কোথায়ও কি একবিন্দু দয়া নেই! নিশ্চয়ই আছে। হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এল। অলস অকর্ম্মণ্য তো সে নয়। দৈনিক বিশ ঘণ্টা পরিশ্রম ক'রেও মাসে কুড়িটি টাকা পেলে সে বেঁচে যায়। এত দেশপ্রাণ নেতা থাকতে সে সত্যিই কি শেষে সপরিবারে না খেয়ে মারা যাবে? তা কি হতে পারে?

সমস্ত ইতিহাস জানিয়ে একখানি চিঠি লিখল সে কোন এক অতি প্রথিতযশ ত্যাগী মহাপুরুষের কাছে—প্রাণপাত পরিশ্রমের বিনিময়ে চারটি লোকের গ্রাসাচ্ছাদন ভিক্ষা ক'রে। য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রীর কথাটাও উল্লেখ করল সে—নিতান্ত ঘৃণাভরে। এই নিরন্ন দেশবাসীর বুকের রক্ত দিয়ে উপার্জ্জিত রাশি রাশি টাকা এসে পড়ছে যাঁর হাতে এই দেশকেই বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে, তাঁর এক কণা করুণারও কি অযোগ্য সে? চিঠিখানি পোষ্ট ক'রে একটা নতুন আশায় একটু তাজা হয়ে উঠল সে।

আরও দু-তিনদিন কেটে গেছে। শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। অর্দ্ধাশনে এই দারুণ চিন্তার বোঝা মাথায় ক'রে তার জীবনীশক্তি ক্ষয় হয়ে আসছিল। নলিন টলতে টলতে চলল কোন এক দয়ালু দেশপূজ্য

মহাত্মার সঙ্গে দেখা করতে। অতিকষ্টে সাক্ষাৎ পেল তাঁর, আর্দ্রচক্ষে জানালে তার দুঃখের কাহিনী। হায়, সেখানেও ওই বিফলতা, ওই পরিহাস! শুধু রকমের একটু তফাৎ। কোথায় কোন্ দোকানে ক গ্লাস সরবৎ বিক্রি হচ্ছে, কোথায় ক খিলি পানে কত লাভ হচ্ছে, আরও কত রকমের কথা! ঘুলিয়ে গেল তার মাথা, ভেসে গেল তার প্রার্থনা বক্তৃতার স্রোতে। চারিদিক থেকে মহাপুরুষের স্তাবকেরা চেয়ে ছিল তার দিকে বিদ্রূপের চোখে। ক্ষিপ্তের মত সে ছুটে পালাল। এক খিলি পান কেনবারও যার পয়সা নেই, চারটি জীবন যাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে, সে এ অবস্থায় পানের দোকানই বা করে কি ক'রে! ওসব আর কিছুই নয়, প্রত্যাখ্যানের ফন্দি। উঃ, কি নৃশংসতা!

তিন দিন না হতেই চার আনা ফুরিয়ে গেল। সারাদিন পরিশ্রমে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত্ত নলিন তার বাজেট রাখতে পারল না। মেসে আবার নতুন বোর্ডার এসেছে। তার একমাত্র বিশ্রামের স্থানটুকু হতেও তাকে বিতাড়িত হতে হ'ল। অনেক কাকুতি-মিনতির পর কাঠকয়লা রাখার ঘরটিতে দু-একদিন থাকবার জন্য অনুমতি পেল সে। বেশভূষা বা চেহারায় তাকে আর ভদ্রসন্তান ব'লে চেনা যায় না। তবুও থাকতে হবে তাকে, যদি তার আবেদনের একটা আশাপ্রদ উত্তর পায় সে।

ঘরে ব'সে থাকতে পারে না, কে যেন ভিতর থেকে কশাঘাত করতে থাকে। রাস্তায় সে বেরিয়ে পড়ল। ভিক্ষা কিম্বা চুরি, তা ছাড়া আর উপায় নেই। চুরি? ছি ছি, শুভার স্বামী না আমি? মা কি একটা চোরকে গর্ভে ধরেছিলেন? তবে, ভিক্ষা—হীন ভিক্ষা? ভিক্ষাই বা কে দেবে? বুড়ো নই, কানা নই, খোঁড়া নই, তবুও ভিক্ষা করতে হবে, বাঁচতে হবে। নিজের জন্য নয়, মা বোন স্ত্রীর

জন্য। ভিক্ষা কেমন ক'রে চাইতে হয় তাও তো জানা নেই। চাইলেই হয়তো পাওয়া যায়, নচেৎ এত ভিখারী বাঁচে কিসে! এই তো কত ফিটফাট বাবু চলেছে। এক পয়সার একটা সিগারেট দু তিন মিনিটে পুড়িয়ে দিচ্ছে। একটা পয়সা ভিক্ষা এরা নিশ্চয়ই দেবে।

মশায়, দয়া ক'রে একটা কথা শুনবেন?

বাবুটি তার মুখের দিকে একবার তাকিয়েই সিগারেট টানতে টানতে চলনের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিল আর মুখ বেকিয়ে ব'লে গেল, বেড়ে ব্যবসা পেয়েছ যা হোক!

একজন, দুজন, তিনজন—সবারই এক কথা। একটি পয়সাও কেউ হাতে তুলে দিল না। একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নলিন বললে, যাই এবার ওইখানে, যেখানে নগ্ন কদর্য্যতা বিকট মূর্ত্তিতে রাশি রাশি টাকা গিলে খাচ্ছে।

রূপজীবিনীরা রাস্তার দুধারে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে শীকার ধরতে, তাদের সুসজ্জিত দেহগুলির অন্তরালে এক একটা তপ্ত জ্বালাময় মরুভূমির মত হৃদয় নিয়ে। তাদের চাউনিতে রক্ত শুকিয়ে যায়, হাসিতে হৃদয় কেঁপে ওঠে। এই কপট রূপের আগুন-শিখায় শত শত হতভাগ্য পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে। একেবারে মরছে না, বেরিয়ে আসছে আধপোড়া হয়ে—জীবনের সমস্ত লালিত্য, সমস্ত মাধুর্য্যটুকু বিসর্জ্জন দিয়ে। নিরালা ঘরের কোণে বুকভরা ভালবাসা নিয়ে কত স্নেহকরুণ হৃদয় হয়তো এদেরই প্রতীক্ষায় ব'সে আছে, তাদের স্নিগ্ধ শীতলতা দিয়ে এই আধপোড়া পতঙ্গগুলোর জ্বালা নিভাবার জন্য! নলিন পিছিয়ে এল। গলির মুখে একজন বড় রকমের বাবু যাচ্ছিলেন এসেন্সের গন্ধ ছড়িয়ে। নলিন সামনে গিয়ে দাঁড়াল, দয়া ক'রে একটা পয়—সা—

হঠ যাও শূয়ার, এখানে মরদের জন্যে কেউ পয়সা নিয়ে আসে নি।

ধাক্কা খেয়ে পড়তে পড়তে নলিন সামলে গেল। চারদিক থেকে একটা হাসির হর্‌রা উঠল। ভগবান! মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন বিজলি বাতিগুলি সব নিভে গেল, আর একটা বিকট নরকের অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলল। শুধু নারীকণ্ঠের একটা সহানুভূতি-সূচক প্রতিবাদ সেই কোলাহলের মধ্যেও ধ্বনিত হয়ে মিশে গেল।

পরদিন রাত্রে। দারুণ ক্ষুধা! জঠরানল দাউ দাউ ক'রে জ্বলছিল। মাথার মধ্যে কে যেন কয়লার উনুনে আঁচ দিয়েছে,—ভিতরে জ্বলে যাচ্ছে, উপরে ধোঁয়া! সে আজ দুদিন কিছু খায় নি। শরীর ঝিমঝিম করছিল। নোংরা অন্ধকার ঘরটার মধ্যে প'ড়ে সে ছটফট করছিল। একটু বাতাসও কি নেই ছাই! ক্ষুধা, ক্ষুধা! ঠাকুরকে বললে কি দুটি ভাত দেবে না? ডাল তরকারি নয়, শুধু ভাত, রোজই তো কত ফেলা যায়! না, দেবে না। উড়ে বামুন, বড় নির্দ্দয়, আর অপমানও করবে। মেসের লোকে জানতে পারলে এ আশ্রয়টুকুও হারাতে হবে। এখন উপায়? আর তো দেহ নড়তে চায় না। গলির মধ্যে একটা বাড়িতে বিয়ের বাজনা বাজছিল। নলিন ভাবল এই তো এক উপায় আছে। তখনই মনে হ'ল, না, ভিখারী ব'লে তাড়িয়ে দেবে। ছিন্ন মলিন কাপড়, ধূলোমাখা রুক্ষ চুল, শীর্ণ মূর্ত্তি, তার উপর সারা গায়ে কয়লার কালি। বাঃ! কি চমৎকার সেজেছি। এখন যদি মা বা শুভার সঙ্গে দেখা হয়! হু হু ক'রে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। ঠোঁট দুখানি তার থরথর ক'রে কেঁপে উঠল। প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও নলিন তাদের থামাতে পারল না।

চোখের জল ঝ'রে ঝ'রে আপনা হতেই শুকিয়ে গেল। সবাই খেয়ে দেয়ে যে যার ঘরে চ'লে গেছে। ঝি বাসনগুলো গুছিয়ে রেখে

এক থালায় দুজনের ভাত তরকারি বোঝাই ক'রে বিদায় হয়েছে। উড়ে বামুনও বেরিয়ে গেল।

না, আর সহ্য হয় না। বাঁচতে হবে। মাকে, শুভাকে, বোনটিকে বাঁচাতে হবে। আহার চাই, নইলে এ রাত বুঝি আর প্রভাত হবে না। কে যেন তাকে ঝটকা মেরে তুলে দিল। বারান্দার পাশে এঁটো বাসনগুলি প'ড়ে ছিল, তার কোন কোন থালায় কিছু কিছু ভাত ছিল। সে তখন পাগল! হায় বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা! নলিন চোরের মত গিয়ে ভাতগুলি থাবা থাবা ক'রে উদরস্থ করতে লাগল। ভয়ে তার গা কাঁপছিল, কেউ যদি দেখতে পায়! হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন ব'লে উঠল, ছি ছি ছি, এতদূর হয়েছে তোমার! সহসা গুরুতর ভয় পেলে মাতালের যেমন মাতলামি ছুটে যায়, ঠিক তেমনই নলিনের বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। লজ্জায় ভয়ে সে এতটুকু হয়ে গেল। তার পূর্ব্বপরিচিত সেই যুবকটির দিকে সে সভয়করুণ চোখে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চেয়ে রইল।

বিনিদ্র রাত কেটে গেল। একটা অবর্ণনীয় গ্লানিতে নলিন প্রায় সংজ্ঞাহারা হয়ে পড়েছিল। তখনও মুমূর্ষুর জীবন-প্রদীপের মত একটা ক্ষীণ আশার আলো ধিকিধিকি জ্বলছিল। তাও যদি নিবে যায়! তবে মাত্র এক পথ।

সকালে একসঙ্গে দুখানা চিঠি পেল সে। একখানা শুভার আর একখানা তার আবেদনের উত্তর। নিজেকে খুব শক্ত ক'রে নিয়ে সে শেষের চিঠিখানা খুলে ফেলল। সামান্য কটি কথা। দেশ ও দরিদ্রের হিতার্থে সংগৃহীত অর্থের এক কপর্দ্দকও অন্য উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হয় না। নলিন পাথরের মত কঠিন হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে আপনা থেকে বেরিয়ে পড়ল, ভণ্ডামি, জোচ্চুরি, শয়তানি, এর চেয়ে

কপটতা, এর চেয়ে আত্মপ্রবঞ্চনা আর কি আছে! দেশ! আমি কি দেশের কেউ নই! আর দরিদ্র, আমার চেয়ে বড় দরিদ্র আর কে আছে!

টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে সে চিঠিখানিকে ফেলে দিল।

তারপর শুভার চিঠি, "ওগো, তুমি চলে এস। আমি আর পারছি না। মাকে বুঝি আর বাঁচানো যায় না। তার ওপর মানুষের অত্যাচারও আর সইতে পারি না। যে অবস্থায় থাক চলে এস।......"

চারিদিকে প্রলয়ের আগুন দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠল। মানুষের উপর ঘৃণায় বিদ্বেষে সে ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। তার দুর্ব্বল নুয়ে-পড়া দেহটা কি একটা বৈদ্যুতিক শক্তিতে সোজা হয়ে উঠল। তার নীচের ঠোঁটখানি দাঁতের চাপে কেটে যাবার উপক্রম হচ্ছিল।

ঠিক সেই সময়ে সেই যুবকটি এসে তার কাঠের মত শক্ত দেহ-খানি জড়িয়ে ধ'রে বললে, ভয় কি বন্ধু, অভাব কিসের?

কেরানি

ঘুম থেকে উঠেই তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে কাঁধের ওপর জামাটা ফেলে আদালতের নামজাদা কেরানি শ্রীযুক্ত পীতাম্বর পুততুণ্ডা মহাশয় হনহন ক'রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন। রাস্তায় পা দিতে না দিতেই পুততুণ্ডা মহাশয়ের অবিবাহিতা প্রথমা কন্যা কুমারী মেরী ওরফে বুঁচি, বয়স প্রায় কুড়ি বছরের কাছাকাছি, ব্যস্ত হয়ে বাঁশ-বেড়ার ফটক অবধি ছুটে এসে ডাকল, বাবা, বাবা!

পিছন ফিরে গলাটাকে বকের মত সামনের দিকে যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে পীতাম্বর বললেন, তার থেকে এই নে, খাঁড়াখানা নিয়ে আয় দেখি মা! এক ঘা বসিয়ে দে, একেবারে বলি হয়ে যাই।

বুঁচি থতমত খেয়ে বললে, গোপাল যে বড় মিইয়ে পড়েছে। মা থার্ম্মোমিটার দিয়ে বললেন, সকালেও আজ পাঁচ ডিগ্রী জ্বর রয়েছে। একটা ডাক্তার—

কান বাদে গলা থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত আলোড়িত ক'রে পীতাম্বর বললেন, আরে যা যা, তোর মার তো বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ লেগেই আছে। চলেছি একটা জরুরি কাজে, তা না, পেছন থেকে—বাবা, বাবা!

জড়সড় হয়ে বুঁচি বললে, অন্যদিন তো সকালে দু ডিগ্রীর বেশি জ্বর থাকে না, তাই—

তাই হয়েছে কি ? যা না, মাথায় খানিক জল দে গিয়ে, জ্বর নেবে যাবে 'খন। এখন আমার মরবারও সময় নেই। আর মাসের শেষে ডাক্তারের টাকা আসবে কোথা থেকে ?

ঝুঁচি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। সরকার বাহাদুরের কঠোর দায়িত্ব-জ্ঞানী কর্ম্মচারী পীতাম্বর রওনা হলেন তাঁর কর্ত্তব্যপথে।

রাস্তার ধারে গোটা দুই বাড়ি বাদেই হরনাথের বাসা। সেও আদালতের কেরানি; প্রশংসার সঙ্গে য়ুনিভার্সিটির একটা ডিগ্রী পেয়ে অতিকষ্টে আদালতে ঢুকেছিল দশ টাকার অ্যাপ্রেন্টিস হয়ে। এখন চুয়ান্ন টাকায় পৌঁচেছে বছর বারো পরে। হরনাথ রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে দাঁতন করছিল। পীতাম্বর কাছে এসে পড়লে সে বললে, কি দাদা, ছেলেটার ওইরকম অসুখ, কি এমন জরুরি কাজ পড়ল সকালবেলা ?

এক গাল হেসে পীতাম্বর উত্তর করলেন, আরে দাদা, বল কেন, সেরেজদারবাবুর এক মিনিটও আমি ছাড়া চলে না। কি যে দেখেছেন আমার মধ্যে !

হরনাথ তাঁকে বিলক্ষণ চিনত। সে হাসতে হাসতে বললে, তা তো জানিই, কিন্তু এখন কি দরকার পড়ল এমন, যাতে—

পীতাম্বর আর কথা বাড়ানো উচিত মনে করলেন না। সময় নেই, আসি ভায়া, এসে বলব 'খন।—বলতে বলতেই বিশ গজ এগিয়ে পড়লেন। এসে বলার যে মানে কি, তা হরনাথের জানা ছিল।

হরনাথের স্ত্রী গৌরীও বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে বললে, হ্যাঁ গো, দেখেছ, পীতাম্বরবাবুর কি আক্কেল ! ছেলেটির অবস্থা বাস্তবিকই ভাল দেখলাম না। আজ পাঁচ সাত দিন হয়ে গেল, এক ফোঁটা ওষুধ নেই। দিদি তো কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

হরনাথ বললে, আক্কেল তো বলছ, চাকরি করতে হয় কেমন ক'রে, জান?

থাক, তা আমার জেনেও দরকার নেই। এখন যাও না একবার, ছেলেটাকে দেখে এস।

আসি তবে, হুকুম যখন।—ব'লেই হরনাথ উঠে দাঁড়াল, কিন্তু যাবার লক্ষণ দেখা গেল না।

হাঁ, হুকুম। তোমার কেবল কথাই সার। এখন আমার সঙ্গে কথা কাটাকাটি না ক'রে ওখানে গিয়ে খানিক বস গে। আর পার তো, একটা ডাক্তারের ব্যবস্থা ক'রে দিও। আমি রাঁধতে চললাম।

হরনাথ চোখদুটি মোটা ক'রে একদৃষ্টে গৌরীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললে, বাপ রে, যেন ঝাঁসীর রাণী, যুদ্ধে চলেছেন! হাসির একটা প্রবল বন্যা জোর ক'রে মুখের ভিতর আটকে রেখে গৌরী হরনাথকে পিছন থেকে ঠেলতে ঠেলতে দরজা অবধি পৌঁছে দিয়ে এল।

কই রে বুঁচি, গোপাল কোন্ ঘরে?—বলতে বলতে হরনাথ পীতাম্বরবাবুর বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। বুঁচি রান্নাঘর থেকে সাড়া দিয়ে বললে, ওই যে, ওই ছোট ঘরে। যান না, ওখানে মা আছেন। ও মা, ও বাড়ির কাকাবাবু এসেছেন।

ছোট ছোট আরও গুটিচার ছেলেমেয়ে উঠানে খেলা করছিল। ঘরের দরজা অবধি যেতেই পীতাম্বরবাবুর স্ত্রী যশোদা বললেন, এস ঠাকুরপো, কি বিপদেই যে পড়েছি! উনি তো সকাল না হতেই বেরিয়ে গেছেন। সে তো আমার গা-সওয়া হয়ে গেছে। যাক, এখন কি করি বল তো? চারদিন মোটেই রেমিশন হয় নি, আজ তো একেবারে বেহুঁস হয়ে আছে। গাটা পুড়ে যাচ্ছে, পাঁচ ডিগ্রী জ্বর।

হরনাথ বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটির গায়ে মাথায় হাত দিয়ে দেখল। তারপর ঘরখানির চারিপাশে একবার তাকিয়ে বললে, তাই তো বউদি, এ রোগা ছেলেটাকে স্যাঁৎসেঁতে ঘরটায় না রেখে ওই বড় ঘরে নিলেই তো ভাল হ'ত।

ভাল তো হ'ত ঠাকুরপো, কিন্তু উনি যে তাতে ঘুমুতে পারেন না। বলেন, রাতটুকু যদি না ঘুমব তা হ'লে সারাদিন খাটি কি ক'রে?

তাই নাকি? সে যাক, এখন একটা ডাক্তার দেখানো কিন্তু নিতান্ত উচিত ব'লে মনে হচ্ছে।

আমিও তো তাই মনে করছি।

দাদা কি বলেন?

ওই যে ব'লে গেলেন, মাসের শেষ, এখন টাকা পাই কোথায়?

পীতাম্বরের ওপর হরনাথের মনে মনে ঘৃণা হচ্ছিল। ছেলেটি এবং তার মার মুখের দিকে চেয়ে সে বললে, টাকার জন্য ঠেকবে না, ডাক্তার ডাকাই দরকার।

টাকা না হয় তুমি দিলে, কিন্তু ডাক্তার ডাকা ওষুধপত্তর আনা-নেওয়া করে কে? আমার কি ঠাকুরপো, এক জ্বালা!

কেন মাণিক?

মাণিক বড় ছেলে। বয়স পনেরো ষোল বছর। ক্লাস ফাইভে পড়ে। যশোদা বললেন, তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি ভাই! ছেলেগুলিও যা আমার হয়েছে। লোকজন তো নেই, সকালে ধ'রে বেঁধে বাজারে পাঠাব, দুঘণ্টা পথে পথে খেলে সেই নটার সময় আসবে। পড়াশুনা যা করে তা তো দেখতেই পাচ্ছ, কেউ তো চোখ মেলে দেখে না। এই যে বেরিয়েছে, কখন আসে ঠিক কি!

হরনাথ বললে, আচ্ছা ডাক্তার না হয় আমিই ডেকে দিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু ওষুধপত্তর আনা? আমার তো আবার আপিস আছে।

তাই না হয় তুমি দাও ঠাকুপো, তারপর যা হয় করব 'খন।

হাঁপাতে হাঁপাতে সেরেস্তাদারবাবুর বাসায় গিয়ে পীতাম্বর একটা সভক্তি নমস্কার ক'রে দাঁড়ালেন। সেরেস্তাদারবাবু বললেন, এই যে পীতাম্বরবাবু, ঘেমে গিয়েছ যে, ব'স ব'স, ব্যাপার কি?

আমার কথা আর শুনবেন না সার্, একটা ছেলের অসুখ নিয়ে ভারী বিপদে আছি, কাল সারাটা রাত ঘুমোই নি। এখানে একবার না এসেও তো পারি না, তাই এলাম ছুটতে ছুটতে। খোকাবাবু আজ কেমন আছেন?

আজ আর জ্বর নেই। কাল একশো অবধি হয়েছিল। এখন ভালই আছে।

মস্ত একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে পীতাম্বর বললেন, যাক, তা হ'লে আর চিন্তার কারণ নেই।

সেরেস্তাদারবাবু বললেন, ম্যালেরিয়া কিনা, ওরকম ওর মাঝে মাঝে হয়।

তা ব'লে তো চুপ ক'রে থাকা যায় না সার্, ম্যালেরিয়া তো সোজা জিনিস নয়। তা আজ আর কোন ওষুধপত্তর দেবেন না?

অন্য ওষুধ আর কি? কুইনাইন।

ভাল কুইনাইন আছে তো? যে সে কুইনাইন দিলে আবার মাথা অ্যাফেক্ট করবে, ছেলেমানুষ তো!

পোষ্ট-আপিসের কুইনাইন আছে বোধ হয়।

না না, তাতে হবে না। বাই-হাইড্রোক্লোরাইড দরকার। আচ্ছা, আমিই এনে দিয়ে যাচ্ছি।—ব'লেই পীতাম্বর ডাক্তারখানায় রওনা হলেন।

সেরেস্তাদার বললেন, দাম নিয়ে গেলেন না পীতাম্বরবাবু?

পকেটটাকে যেতে যেতে একটা নাড়া দিয়ে পীতাম্বর বললেন, আছে আছে সার্, আমার সঙ্গে আছে, এসে নেব 'খন।

সেরেস্তাদারবাবুর বৈঠকখানায় 'শো রেস্‌পেক্ট' করতে জুনিয়র ও সিনিয়র আরও কয়েকজন আমলা বসেছিল, পীতাম্বর বেরিয়ে যেতে সেরেস্তাদারবাবু বললেন, এই পীতাম্বরবাবু লোকটি বড় অমায়িক, তা ছাড়া ওর বেশ পার্টস আছে।

জুনিয়ররা মনে মনে পীতাম্বরকে আদর্শ ক'রে নিল, আর সিনিয়ররা টু-উ লেট! ভাবছিল, পীতাম্বর থাকতে আর আশা নেই, তবে এরই মধ্যে যতটা যা হয়, অন্তত সেকেণ্ড প্লেসটাও যদি থাকে!

আসর ভেঙে সেরেস্তাদারবাবু ভিতরে প্রবেশ করবার একটু পরেই পীতাম্বর এসে ডাকলেন, ঠাকুর, ও ঠাকুর!

ঠাকুর বেরিয়ে এলে পীতাম্বর তার হাতে কুইনাইনের শিশি আর একটি পাতিলেবু দিয়ে বললেন, ভিতরে নিয়ে দাও গে, লেবুটি খোকা-বাবুর পথ্যের জন্যে এনেছি। আমি চললাম, বেলা হয়ে গেছে।

ঠাকুর মুখ বেজার ক'রে বললে, বেলা হয়ে গেছে তা সকাল সকাল আসতে পারেন নি মশায়? সময়ে অসময়ে বড় বিরক্ত করেন আপনি।

পীতাম্বর সে কথা কানে না তুলে স'রে পড়লেন।

বাড়ি ঢুকতে দরজার মুখে হরনাথের সঙ্গে দেখা হ'ল। কি হে ভায়া, ব্যাপার কি?

ব্যাপার আর কি? খুব চাকরি শিখেছ দাদা! ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধ এনে রেখে গেলাম; এখন যা খুশি কর গে।

টাকা, টাকা?

টাকা আমি দিয়ে দিয়েছি; দিতে হয় দিও।—ব'লেই হরনাথ পিছন ফিরল।

পীতাম্বর বিমর্ষভাবে বললেন, টাকা আর তোমায় দোব না কেন ভায়া? তবে একটা ফালতো খরচে ফেললে। আমার হয়েছে কি জান, মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল!

হরনাথের সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যাচ্ছিল। সে আর কোন কথা না ব'লেই চ'লে এল।

গৌরী বললে, নাও ওঠ, নাওয়া খাওয়া নেই? বেলা হয়ে গেল যে!

এই উঠি, একটু বাকি আছে। ভদ্রলোকের এক্সপ্ল্যানেশনটা বারোটার মধ্যে দাখিল করতে হবে, নইলে তার চাকরি যাবে।

যত রাজ্যের লেখালেখি বুঝি সব তোমার?

কি করি বল, এড়াতে পারি না।

বলি এত লেখা লেখ, নিজের কর কি? মাইনে তো ওই চুয়ান্ন টাকা।

হরনাথ রাত্রে টুইশনি করে, আর সকালবেলাটা যায় তার প্রায়ই পরের বেগার খেটে। মাঝে মাঝে আবার একটু আধটু সাহিত্য-চর্চ্চাও আছে। সে নিজের মনে লিখতেই লাগল। গৌরী তাকে ক্ষেপিয়ে তোলবার জন্যে টেনে টেনে সুর ক'রে বলতে লাগল—

এত লেখে এত পড়ে এত ছাপা ছাপে—
তবু পদ নাহি পায় আবাগীর পাপে।

যদিও মুখে তার হাসি ফুটে বেরচ্ছিল, হরনাথ কপট বিরক্তির স্বরে বললে, কি উপসর্গ! ভারি পাজি তো!

গৌরী খিলখিল ক'রে হাসতে হাসতে বললে, উপসর্গ একটা গালাগালিই নয়; তবে পাজিটা—। আচ্ছা, উপসর্গ কুড়িটা না? আর রবিবাবুর সেই কি—'বলিলাম পাজী বের তুই আজি'?

হরনাথ তাড়াতাড়ি লেখা শেষ ক'রে কলমটা রাখতে রাখতে বললে, রাখ, তোমার দুষ্টুমি বার করছি।—ব'লেই উঠে দাঁড়িয়ে গৌরীকে দুহাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে একটা চুমো খেল।

আপিসে যেতে হরনাথের সেদিন সত্যি একটু বেলা হয়ে গেল। সেরেস্তাদারবাবু ঠিক সেইদিনই এগারোটার সময়ে উপস্থিত হয়ে তাকে আপিসে পেলেন না। পীতাম্বরের মত নয়, বাস্তবিকই হরনাথের পার্টস ছিল। কিন্তু যে পার্টসের অভাবে অনেক ভাল অফিসারই তলিয়ে যায়, সেই পার্টসই তার ছিল না। কাজেই সেরেস্তাদারবাবুর গুড-বুকে তার নাম ছিল না। যদিও খোদ জজসাহেবের দৃষ্টি সে ছোটখাটো দুই একটা কাজে একটু আকর্ষণ করেছিল। পীতাম্বর ঠিক সময়ে আপিসে হাজির হয়ে সামনে কতকগুলি কাগজ খুলে রেখে সেদিন কোন্ কোন্ মক্কেলের কাছে কটা সিকি পাবার কথা আছে, মনে মনে তারই হিসাব করছিল। এই সময়ে সেরেস্তাদার তার ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, হরনাথের বাসা আপনার পাড়ায় না? ছোকরার হয়েছে কি?

সসম্মানে উঠে দাঁড়িয়ে পীতাম্বর বললেন, আজ্ঞে, হয় নি তো।

তবে লেট করে কেন?

মাথা চুলকাতে চুলকাতে পীতাম্বর বললেন, ওরা হচ্ছে, সার্, গ্র্যাজুয়েট মানুষ, খেয়ে দেয়ে একটু বিশ্রাম করতে দেরি হয়ে যায়। আমাদের মত তো নয়, বাড়িতে মড়া ফেলে আপিসে ছুটি।

গম্ভীরভাবে সেরেস্তাদারবাবু বললেন, তা মন্দ নয়। ছোকরা

গ্র্যাজুয়েট না? এক কলম লিখতে তো কলম ভাঙে। আমাদের সময়ের এন্‌ট্র্যান্সের বিদ্যেও যদি থাকত!

তা হ'লে আর ভাবনা ছিল কি সার্!—ব'লেই পীতাম্বর একটু থেমেই পূর্ব্বের মত আস্তে আস্তে বললেন, আবার জজসাহেবের মেয়েকেও পড়ায় কিনা!

পড়ায় নাকি! ওঃ, বুঝেছি, তাতেও মাথাটা কিছু গরম হয়েছে। আচ্ছা, দেখা যাক। সেরেস্তাদারবাবু বিদায় হলেন।

আদালতের নাজিরের রিটায়ার করবার সময় হয়েছিল। পীতাম্বরের আশা—দুজনকে সুপারসিড ক'রে নাজিরী পদ দখল করে। এদিকে কেউ কেউ বলছিল, ঠিক বলা যাচ্ছে না অদৃষ্টদেবী কার ভাগ্যে অধিষ্ঠান হন। হরনাথের ওপর সাহেবের যেন একটু নজর আছে, ওই হয়তো শেষে সবাইকে টপকাবে। অন্তর্দ্দাহ হয়েছিল পীতাম্বরের, হরনাথ ছিল একেবারেই নির্ব্বিকার।

কয়েকদিন কেটে গেছে। গোপালের জ্বর ছেড়েছে বটে কিন্তু পথ্য পায় নি। আপিস থেকে এসে হাত মুখ ধুয়ে জলযোগ সেরে পীতাম্বর বড় ঘরের বারান্দায় ব'সে তামাক টানছিলেন। পীতাম্বরের স্ত্রী রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন। বুঁচি বেড়াতে বেরিয়েছিল। ছোট ছেলেমেয়ে কটি রাস্তার ধূলো কুড়িয়ে সর্ব্বাঙ্গে ফাগ মাখছিল। ঘরের ভিতর শুয়ে গোপাল ক্ষীণকণ্ঠে চেঁচাচ্ছিল, ও মা, এদিকে এস, আমি একা থাকতে পারছি না।

যশোদার হাত খালি ছিল না, তার ওপর কোলে একটি কচি।

তিনি পীতাম্বরকে ডেকে বললেন, ওগো, যাও না একটু ছেলেটার কাছে। রোগা ছেলে, একলা রয়েছে।

পীতাম্বর ত্যক্ত হয়ে বললেন, তোমরা ভারি অবুঝ, দেখছ আপিস থেকে তেতে পুড়ে এসে একটু ঠাণ্ডা হচ্ছি!

অনেকক্ষণ তো এসেছ। এখন একটু ছেলেটাকে নিলেই বা! আমার হাতজোড়া, বুঁচিকেও তো সময়মত ডেকে পাবার জো নেই। অত বড় মেয়ে, দিন রাত চণ্ডীদাসের সুর ভেঁজে বেড়াচ্ছে। একা কত দিক সামলাই?

পীতাম্বর বললেন, ঘরে বড্ড গরম।

ঘরে গরম লাগে, না হয় একটু বাইরে নিয়ে এসেই ব'স। ওরাও তো একটু বাপের আদর চায়। যেমন শাসন দরকার, তেমনই আদরও দরকার। হতাদরে ওরাও সব ব'য়ে যাচ্ছে।

মহা উত্যক্ত হয়ে পীতাম্বর বললেন, যায় তো গেল, তুমি আর হরঘড়ি আমায় উপদেশ দিতে এস না। দেখছি, একটু বিশ্রাম করতে দিলে না।

অবিরত পীতাম্বরের বদমেজাজ দেখে দেখে আর দুর্ব্বাক্য শুনে শুনে যশোদারও মুখ বন্ধ ক'রে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ছেলেমেয়ের ঝঞ্ঝাট আর সংসারের যাবতীয় কাজ ক'রে দিনান্তেও তার একবিন্দু বিশ্রাম ছিল না।

আমাকেই বা কখন একটু বসতে দেখেছ যে অন্যায় রাগ করছ? ঠেকে আছি, তাই ছেলেটার কাছে একটু যেতে বলেছি, এই তো! থাক, তুমি আর মুখ কালা ক'র না। আমিই যাচ্ছি।—যশোদা গোপালকে এনে রান্নাঘরে একটা পিঁড়ির ওপর বসিয়ে দিলেন।

হুঁকো ফেলে পীতাম্বরের কিন্তু একটুও নড়বার লক্ষণ দেখা

গেল না। পরন্তু, কপালের উপর নব লক্ষ ভাঁজ ফেলে যথাসম্ভব নাকটাকে টেনে ওপরে তুলে পীতাম্বর বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, ভারি যে পেয়ে বসেছ দেখছি।

অবিবেচক স্বামীর ব্যবহারে যশোদার কান্না আসছিল। তিনি ক্ষুব্ধস্বরে বললেন, আমি এতবড় পেত্নী হই নি যে, তোমার মত ভূতকে পাই।

হুঁকো থেকে মুখ তুলে চোখ দুটো বড় ক'রে পীতাম্বর উত্তর করলেন, দেখ, ভূতফুত ব'ল না কিন্তু, আমি পীতাম্বর পুততুণ্ডা। চেন তো?

অন্যদিন এক্ষেত্রে যশোদা অনেক আগেই থেমে যেতেন, কিন্তু ছেলের অসুখের ব্যাপারে তাঁর মেজাজ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তিনি সমান জোরে উত্তর করলেন, খুব চিনি, আজ বাইশ বছর ধ'রে চিনছি। এখন জায়গায় ব'সে নেজ না নেড়ে কোথায় বেরুতে চাচ্ছিলে, বেরিয়ে পড়।

আর যায় কোথায়! হুঁকোটাকে ছুঁড়ে ফেলে পীতাম্বর লাফিয়ে উঠে বললেন, আমি ভূত? আমি জানোয়ার যে নেজ নাড়ব? একেবারে যা নয় তাই? জান, আমার বাপ ঠাকুর্দ্দার কটা বিয়ে?

জানি জানি, সেই যুগ এখনও ব'সে আছে। সাত ছেলের বাপ, তেরো জন তোমায় মেয়ে দিচ্ছে। আর দেয় তো দেবে, এত কি চোর দায়ে ধরা পড়েছি?

বটে, রাগিও না বলছি, সর্ব্বনাশ হবে। আমি একজন ডাকসাইটের নামজাদা আমলা, আমায় দেবে না মেয়ে?

দুঃখে ক্রোধে লজ্জায় যশোদার কণ্ঠরোধ হয়ে গেল। তিনি কেঁদে ফেললেন। এই সময়ে শ্রীমান মাণিক 'হিপ হিপ হুররে' ব'লে চেঁচাতে চেঁচাতে ঝড়ের মত এসে ভিতরে লাফিয়ে পড়ল। মুখখানাকে

ডারুইনের মতে মানুষের পূর্ব্বপুরুষের মত ক'রে পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করলেন, কোথায় গিয়েছিলি রে হতভাগা ?

তড়াক ক'রে একটা লাফ দিয়ে মাণিক বললে, কেন, মাঠে—খেলতে।

পীতাম্বর ব'লে উঠলেন, খেলতে, না, গোধন চরাতে ? আহা-হা, নন্দদুলাল আমার ! যশোদা নাচাত তোরে ব'লে নীলমণি।

গতিক ভাল নয় বুঝে মাণিক একছুটে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। পীতাম্বর দ্বন্দ্বযুদ্ধে অরাতিকে পরাস্ত ক'রে হৃষ্টমনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

সন্ধ্যাবেলায় হরনাথ যাচ্ছিল জজসাহেবের মেয়েকে পড়াতে। সেখানে সে পঁচিশ টাকা ক'রে পেত। মোড়ের মাথায়পীতাম্বরের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। কোলে একটি ছেলে। হরনাথ হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলে, কি দাদা, ছেলে কার ? ছেলেমেয়ে তো তোমায় কখনও কোলে নিতে দেখি নি !

অপ্রস্তুত হয়ে পীতাম্বর বললেন, আর ব'ল না ভায়া, এটি সেরেজদারবাবুর ছেলে, আমাকে পেলে আর ছাড়ে না। কি করি বল ?

বেশ, বেশ। যা করার তা তো করছই। তবে, নিজেরগুলি যে মাঠে মারা যায়। শ্লেষভরে কথা কটি ব'লে হরনাথ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। হায় রে গোলামি! সে ভাবছিল, আমিও তো ওদেরই একজন।

হরনাথের শ্লেষোক্তি পীতাম্বরের মনে খুবই লাগল। সেরেস্তাদারবাবু ঈজিচেয়ারে সটান হয়ে আরাম করছিলেন। পীতাম্বর এসেই তাঁকে জানালেন হরনাথের আস্পর্দ্ধার কথা।

আপনি একেবারে সদাশিব সার্, তাইতে এইসব চুনোপুঁটিও যা তা ব'লে রেহাই পেয়ে যায়।

সেরেস্তাদার মনে মনে হরনাথকে ভাল রকমই বুঝেছিলেন। পীতাম্বরকে চিনতে তো একটুও বাকি ছিল না। কত রকম জীব নিয়ে তাঁকে চলতে হয়, লোকটি তো আর বোকা নয়। তবে খোসামোদে দেবতা তুষ্ট, মানুষ তো কোন্ ছার। হরনাথের বিশেষ কোন অনিষ্ট করবার ক্ষমতা যে তাঁর নেই তা তিনি ভালই জানতেন, কারণ হরনাথের মত কর্ম্মকুশল সাঁচ্চা আমলা আদালতে আর ছিল না বললেই চলে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটু হাসির সঙ্গে কথাটাকে তিনি উড়িয়েই দিলেন। ব্যর্থ ক্ষোভ গোপন ক'রে পীতাম্বর বললেন, সত্যি কথা বলতে কি সার্, অনেক অফিসার দেখেছি, কিন্তু আপনার মত এমন দয়ালু ক্ষমাশীল চোখে পড়ে নি।

ভিতরে গলদ থাকলে মন আপনা থেকে নুয়ে পড়ে।

পরদিন সকালে উঠেই পীতাম্বর হরনাথের বাড়ি এসে হাজির হলেন। কই হে ভায়া, বেশ আছ ছুটিতে, বউমাটিও যেন আমার একেবারে মা-লক্ষ্মী।

পীতাম্বর বিনা মতলবে কোথাও ঘোরার লোক নন। হরনাথ বুঝতে পারল সব। সে বেরিয়ে এসে বললে, আসুন দাদা, অনেকদিন পরে যে আজ গরিবের দোরে পায়ের ধুলো পড়ল?

আরে ছি ছি, কি যে বল ভায়া! তোমাদের এলেমের জোর আছে, বে-পরোয়া চাকরি ক'রে যাচ্ছ, একটা গেলে আরটা হবে।

আমাদের তো আর তা নয়, গেলে আর হবে না। দিনরাত কি আর সাধে ওই নিয়ে প'ড়ে থাকি !

সে কি দাদা, আদালতের মালিকই তো তোমরা, আমাদের চাকরিও তো তোমাদের হাতে !

মুখের ভাবটা খুব মোলায়েম ক'রে পীতাম্বর বললেন, ও কিছু কথা নয় ভায়া, তবে সেরেস্তাদার একটু ভালবাসে কিনা, তাই তোমাদের ওই ধারণা। কথাটা-আসটা বললে থাকে, এই যা।

তবেই তো হ'ল।

ঠিক ঠিক, কথায় কথায় মনে হ'ল। তোমাকে জানিয়ে রাখাও দরকার। ওই সেদিন তোমার আপিসে যেতে একটু দেরি হ'ল না? বেটা ঠিক এগারোটার সময়ে এসে জিজ্ঞাসা করেছে তোমার কথা। একেবারে তো রেগেমেগে আগুন, আমি ছিলাম তাই রক্ষে; তুমি কিন্তু ব্যাপারটা টেরও পাও নি। একটু খাতির রাখলে যদি পাঁচ-জনের উপকার হয় তো মন্দ কি? ছেলে কোলে নেবার কথা স্ত্রীর কাছে পাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে সেই ভয়ে পীতাম্বরের এই আপ্যায়ন। তা ছাড়া হরনাথের সঙ্গে বন্ধুত্বটাও যে তাঁর বজায় রাখা নিতান্ত দরকার তাও বুঝেছিলেন।

না ব'লেও উপায় নেই, আবার বলতে গেলেও বিপদ। সেদিন পীতাম্বরের মেজাজটা কিছু ভাল দেখে যশোদা বললেন, দেখ, মেয়ে যে আর রাখা চলে না। তোমার তো কোন খেয়ালই নেই।

পীতাম্বর বললেন, রাখা চলে না, তার মানে? এই তো সবে উনিশ চলছে। সেরেস্তাদারের মেয়ে ডলি যে বুঁচির চেয়েও বড়।

তোমার ওই এক কথা! সে মেয়ে একটা পাস করেছে, লেখাপড়ার ওপর রয়েছে। তার সঙ্গে এর তুলনা? না শেখালে লেখাপড়া, না

শেখালে কিছু। এই যে ধিঙ্গিনাচ নেচে বেড়াচ্ছে, একি দেখতে ভাল দেখাচ্ছে?

একটু আধটু গাইতে শিখছিল না ওবাড়ির ওর ওই অনিলদার কাছে?

না না, সে সব আমি বন্ধ ক'রে দিয়েছি। জ্বালার ওপর জ্বালা!

বন্ধ ক'রে দিয়েছ? কেন? গান-বাজনাটা জানা থাকলে পাত্র জোটানো খুব সোজা হয়।

সে শেখার মত শিখতে হয়। যেমন তেমন কপচালেই কি আর গান জানা বলে? ভাল গান জানা মেয়েরও আর অভাব নেই। তারপর ওই অত বড় আইবুড়ো মেয়ে কোন ননীদা ফণীদার কাছে বসে—আমার বরদাস্ত হয় না।

এখন বল কি?

যেমন ক'রে হোক একটা সম্বন্ধ দেখতে।

আচ্ছা, এই তো গেল এক দফা। তারপর?

তারপর ছেলেটির ষোল বছর চলছে, ক্লাস ফাইভে প'ড়ে, অঙ্কে পেয়েছে একটা রসগোল্লা আর ইংরেজীতে পাঁচ না সাত। ওর বয়সী ছেলে সব পাস ক'রে বেরুচ্ছে। কি হবে বল তো? আর তাও তো মা ষষ্ঠীর অনুগ্রহে একটি নয়।

দুই দফা। তারপর?

কোনটাই তো গায়ে মাখ না। পেছনের বেড়াটা প'ড়ে বে-আব্রু হয়ে রয়েছে। পাশের বাড়িতে মস্ত আড্ডা। বয়স্থা মেয়ে বাড়িতে, একটুও কি নজর রাখবে না? আমি মেয়েমানুষ, এসব কি আমার কাজ?

তিন দফা। তারপর?

তারপর চার দফা আর যশোদাকে বলতে হ'ল না। মাণিক উচ্চৈঃ-স্বরে কাঁদতে কাঁদতে এসে আছড়ে পড়ল। তার কপাল দিয়ে ঝরঝর ক'রে রক্ত ঝরছিল। যশোদা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন, সর্ব্বনেশে ছেলে, কোথায় কি ক'রে এলি?

হাউমাউ ক'রে মাণিক বললে, রমেশের ছেলে কেষ্ট আমার মাথায় মার্ব্বেল ছুঁড়ে মেরেছে, হারামজাদা শালা।

যশোদা নির্ব্বাক হয়ে ঘাস চিবিয়ে ছেলের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধবার আয়োজন করতে লাগলেন; পীতাম্বর হুঙ্কার ক'রে ব'লে উঠলেন, ওই রমেশ উকিলের ছেলে? এত বড় আস্পর্দ্ধা! হারামজাদার গুষ্ঠি নিপাত করব।

রমেশবাবু বাড়ি ছিলেন না, তাঁর বড় দুই ছেলে আর এক ভাইপো ছুটিতে বাড়ি এসেছিল। হঠাৎ তাদের বাপ-কাকার নামে এই অশ্রাব্য গালি কানে যাওয়ায় তারা এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, এমন চাষার মত গাল দিচ্ছেন কেন মশায়?

রাগে কাঁপতে কাঁপতে পীতাম্বর বাইরের উঠানে এসে বললেন, হারামজাদারা আবার কৈফিয়ৎ নিতে এসেছ? একেবারে নিমখুন হয়ে গেছে।

তরুণ যুবক সুবোধের রক্ত গরম হয়ে উঠল, মুখ সামলে কথা বলবেন, ফের গাল দিলে চড়িয়ে মুখ ভেঙে দোব।

কি? মুখ ভেঙে দিবি? আমায় চিনিস না? রোস, নিয়ে আসছি বন্দুক, একেবারে সাবাড় ক'রে দিচ্ছি।—পীতাম্বর সবেগে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলেন।

যশোদার তখন ছেলের চেয়ে স্বামীকে নিয়েই বেশি দায়। আহা, কর কি?—ব'লে তিনি পীতাম্বরের হাত ধরলেন।

হাত ছাড়, আজ উড়িয়ে দোব সব শালাদের মাথা।—পীতাম্বর ঝটকা মেরে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বন্দুক হস্তে সলম্ফে যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হলেন।

সাড়ে তিন টাকায় নিলামে খরিদ করা এক বন্দুক পীতাম্বর ধ'রে পাকড়ে পাস ক'রে রেখেছিলেন লোক দেখানোর জন্য। কস্মিন কালেও তা ব্যবহার হয় নি। পাসের মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছিল, এবং তার জন্য আর পাসেরও প্রয়োজন ছিল না।

বন্দুক দেখে রমেশবাবুর বাড়ির ছেলেরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে পিছিয়ে গেল। সশস্ত্র পীতাম্বর উঠানে দাঁড়িয়ে সদম্ভে বলতে লাগলেন, আমার নাম পীতাম্বর পুততুণ্ডা, সাত জেলার জজ ম্যাজিষ্ট্রেট আমায় চেনে। আজ এইদিনেও আমার ঘরে বন্দুক। আমার সঙ্গে লাগা? উড়িয়ে দোব, সব উড়িয়ে দোব।

হরনাথ চায়ের বাটিটা কেবল মুখে তুলেছে এই সময়ে গৌরী বললে, শুনছ, কি কাণ্ড বেধেছে ও বাড়ি?

শুনছি, যা খুশি হোক গে, চা না খেয়ে নড়ছি না।

গোলমাল বেড়ে উঠল। গৌরী ব্যস্ত হয়ে বললে, হ্যাঁ গো, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও না, ভয়ানক যুদ্ধ বেধেছে।

হরনাথ গম্ভীরভাবে উত্তর করলে, বাধতে দাও, মুখ পুড়ে যাবে যে!

মহা ব্যস্ত হয়ে গৌরী বললে, ওই শোন পীতাম্বরবাবুর গলা, বন্দুক দিয়ে কাকে বুঝি সাবাড় করছে!

করুক না, ব্যস্ত কি? চা-টা খাই আগে।

গৌরীর ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করেছিল। সে কাকুতি ক'রে

বললে, ওগো, তোমার পায়ে পড়ি, ওঠ না, এসে খেয়ো এখন। আবার না হয় চা ক'রে দোব।

পীতাম্বরের বন্দুক হরনাথের অবিদিত ছিল না। সে অবিচলিত-ভাবে চায়ের বাটিতে চুমুক দিতে দিতে বললে, যাও না, অত যদি গরজ প'ড়ে থাকে।

কোলাহলের মাত্রা খুব বেড়ে উঠল; পীতাম্বরের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছিল, বন্দুকে উড়িয়ে দোব ইত্যাদি।

গৌরী অতিষ্ঠ হয়ে উঠল, তোমার পায়ে পড়ি, যাও না গো, খুন হয়ে যাবে যে!

হরনাথ পূর্ব্বের মত ধীরভাবে উত্তর করলে, তুমি এগুতে থাক, আমি আসছি।

গৌরী সভয়ে বললে, বেশ মানুষ তো তুমি, পুতডুণ্ডা যদি ফটাশ ক'রে আমাকেই এক গুলি লাগিয়ে দেয়!

হরনাথ হাসি সামলাতে পারছিল না, সে চায়ের বাটিটা শেষ ক'রে উঠে পড়ল। যেতে যেতে বললে, চললাম তবে তোমার কথায় বন্দুকের মুখে।

একলা যাবে নাকি? আহ্লাদ!—ব'লেই গৌরী সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। কি জানি, বলা তো যায় না!

রাস্তার ওপারে বিপক্ষ বাহিনী, এপারে বন্দুক-হস্তে পুতডুণ্ডা মহাশয়। রাস্তার আশে-পাশে বহুলোক জ'মে গিয়েছে। কাছাকাছি এসে সদর পথে আর এগুতে না পেরে গৌরী হরনাথের হাত ধ'রে বললে, সামনে যেও না, সামনে যেও না।

আমার দেখছি উভয় সঙ্কট, এগুলেও বিপদ, পেছলেও বিপদ!

দেখছ না, বন্দুক রোখাচ্ছে?

বন্দুক না ওটা পুততুণ্ডার মাথা! তুমি ভেতরে যাও দেখি, সেখান থেকেই মজা দেখতে পাবে।

যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে হরনাথ বললে, বাপ রে, দাদা যে একেবারে ভন্ হিণ্ডেনবার্গ হয়ে দাঁড়িয়ে আছ! দিলে নাকি দু-দশটা উড়িয়ে?

রমেশবাবুর বাড়ির ছেলে কটির ওপর নানা কারণে পূর্ব্ব থেকেই পীতাম্বর ক্রুদ্ধ ছিলেন। হরনাথকে দেখে তিনি আরও উত্তেজিতভাবে বললেন, আজ আর ছাড়ব না, ও-বাড়ির সব কটাকে নিকেশ করব।

পাড়ার ছেলেরা হরনাথকে খুব ভালবাসত এবং খাতিরও করত; তাকে দেখে সাহস পেয়ে সুবোধ এগিয়ে এসে বললে, আচ্ছা, দেখুন তো কাণ্ডখানা!

ইসারায় তাকে থামিয়ে দিয়ে হরনাথ বললে, বধ হতে না চাও যদি, তবে স'রে পড় সব, দেখছ না দাদার বন্দুক?

পুততুণ্ডা মহাশয়ের পরিধেয়ও কিছু বে-সামাল হয়ে পড়েছিল। হরনাথ বন্দুক সমেত হাত ধ'রে চুপি চুপি বললে, নাও নাও, কাপড়খানা ঠিক ক'রে প'রে নিয়ে এই সময়ে স'রে এস দাদা। একবার টের পেলে তোমার হাড় ভেঙে দেবে 'খন। হরনাথ তাকে টেনে ভিতরে নিয়ে গেল। যাবার সময় পীতাম্বর ব'লে গেলেন, বড় রক্ষে পেয়ে গেলি আজ আমার হাতে।

যশোদার মুখের দিকে চেয়ে গৌরীর কষ্ট হচ্ছিল বটে, কিন্তু হাসির বেগ সে কিছুতেই থামাতে পারছিল না। বাড়ি এসে হাসতে হাসতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হরনাথ এসে তাকে সেই অবস্থায় দেখে তার সঙ্গে যোগ দিল। দুজনে মিলে সে কি হাসি! কথা বলে কার

সাধ্য! কিছুতেই কি থামে! হাসতে হাসতে দুজনেরই চোখ দিয়ে জল বেরুতে লাগল। বেগটা কিছু ক'মে এলে গৌরী বললে, এ জানলে কি ঠেলে পাঠাই তোমাকে থামাতে? কোথায় লাগে চার্লি!

সেরেস্তাদারের মেয়ের বিয়ে। কদিন থেকে পীতাম্বরের নাওয়া খাওয়ার সময় নেই। যশোদার শরীরটা বড় ভাল ছিল না। সন্ধ্যার সময় পীতাম্বর এলে বললেন, দেখ, একে আমার শরীর খারাপ, তারপর ছেলেমেয়ে কার ওপর ফেলে যাই?

কেন, বুঁচি?

অত বড় মেয়েকে একলা বাড়ি রেখে কি যাওয়া যায়?

তবে যাবে না বল। তোমার মেয়ের ভাবনা, শরীরের ভাবনা! চাকরি আর আমার রাখতে দিলে না!

উঃ, কি অবিবেচক! যশোদা আর প্রতিবাদ না ক'রে ম্লানমুখে বললেন, চল, যাচ্ছি।

উৎসাহভরে পীতাম্বর বললেন, তবে চল চল। গিয়েই সেরেস্ত-দারবাবুর স্ত্রীকে একটা প্রণাম ক'র কিন্তু।

যশোদা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা কি বামুন?

বামুন নয়, তাতে কি?

বল কি তুমি, কৈবর্ত্তকে প্রণাম করব আমি বামুনের মেয়ে হয়ে?

পীতাম্বর বললেন, কিছু বোঝ না তোমরা। গরজ বড় বালাই। আর এই হরিজনের ব্যাপারটাও কি চোখে পড়ছে না?

ফ্যালফ্যাল ক'রে যশোদা স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

দূরে বিয়ের বাজনা বাজছিল। রাত তখন নটা। বাসায় এসে সবেমাত্র হরনাথ হাতমুখ ধুয়ে বসেছে। রামের মা খোকাকে যক্ষী বুড়ীর গল্প বলছে। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে গৌরী বললে, খাবে এস, পোলাও ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ইস, আজ যে খাবার ভারি ঘটা!

গৌরী সকৌতুকে দরদের সুরে বললে, আহা বেচারা, এত বড় নেমন্তন্নটা ছেড়ে দিলে!

ঠোঁটের মধ্যে হাসি রেখে হরনাথ বললে, খুব একখানি রত্ন পেয়েছিলাম যা হোক।

আলবাৎ, আর কথাটি না ব'লে চ'লে এস।

হরনাথ রামের মায়ের কোল থেকে খোকাকে নিয়ে গৌরীর পিছন পিছন সুবোধ বালকের মত রান্নাঘরে ঢুকল।

স্বামীকে খেতে দিয়ে গৌরী বললে, তা একবার গেলেও পারতে।

হরনাথ পোলাওএর গ্রাস মুখে দিতে দিতে বললে, একে তো আপিসে নেমন্তন্ন, তার ওপর আবার বউ নিয়ে যাবার হুকুম; বউটাও যেন সেরেস্তাদারের তাঁবেদার! ছি ছি, ব'ল না আর আমাদের গোলামির কথা!

গৌরী বলল, হ্যাঁগো, তোমাদের ওপরওলাদের কি সাধারণ ভদ্রতা-জ্ঞানটুকুও নেই?

থাকবে না কেন, কিন্তু দরকার হয় কই?

কয়েকমাস পরের কথা। নাজির রিটায়ার করেছে। জজসাহেব ব্যাপারটা সব বুঝে নিয়ে প্রথমত তার নীচের আমলাকেই নাজিরী পদে

বাহাল করেছেন। পীতাম্বর সেরেস্তাদারবাবুর সামনে করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, নাজিরীটা, সার্, তা হ'লে আর আমার হ'ল না!

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে সেরেস্তাদারবাবু বললেন, বাঙালী জজ, এদের কি কোন কাণ্ডজ্ঞান আছে! তবু ভাল হরনাথকে করে নি। ছোকরার যদি একটুও পার্টস থাকত! দুঃখ ক'র না পীতাম্বরবাবু, এ বেটা তো দু'বছর পরেই পেন্সন নিচ্ছে। এবারে তোমার চান্স সিওর।

সভক্তি নমস্কার ক'রে পীতাম্বর বললেন, সেটা আপনার অনুগ্রহ।

অতনুর পুনর্জন্ম

জানালা খুলিয়াই অতনু দেখিতে পাইল, ওপাশের বাড়িখানির দরজা জানালার পর্দ্দাগুলি অপসৃত হইয়াছে। আলনা ব্র্যাকেট সব শূন্য। ছাতে লোহার তারে রং-বেরঙের পরিচিত শাড়ি কখানির একখানিও শুকাইতেছে না। মুক্ত জানালার ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া সে দেখিল যে গৃহাভ্যন্তরস্থ দ্রব্যগুলি স্থানচ্যুত। শয্যাসম্ভার চর্ম্ম ও রজ্জুর বন্ধনে স্তূপীকৃত। বুকের মধ্যে যেন কেমন করিয়া উঠিল। কি ঘটিতে চলিয়াছে সে সম্বন্ধে অতনুর আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ রহিল না। সে যে আজ দীর্ঘ তিন মাস ধরিয়া কলিকাতার সমস্ত আনন্দ-উৎসব বর্জ্জন করিয়া দিবসের অধিকাংশ সময় এই জানালাটির পাশে বসিয়া তাহার কল্পনাকে সজীব করিয়া তুলিয়াছে, তাহার ক্ষুধিত হৃদয় যে বাড়িখানির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাহার কাম্যবস্তুর সন্ধান পাইয়া তৃপ্ত হইয়াছে। কোন্ প্রলয়ের ঝঞ্ঝা আজ এক মুহূর্ত্তে তাহার সেই কল্পনা-রাজ্যটিকে লণ্ডভণ্ড করিয়া দিতে চলিয়াছে! নিশ্চেষ্ট হইয়া ভাবিলে চলিবে না। অতনু টেবিলের উপর হইতে চাবি লইয়া বাক্স খুলিয়া ফেলিল। রুমালে বাঁধা তহবিল বাহির করিয়া দেখিল, ষাট টাকা তেরো আনা। পকেটে হাত দিয়া মনিব্যাগ বাহির করিল, এগারো টাকা ছয় আনা। যথেষ্ট, বাংলা দেশের যে কোন প্রান্তে

অভিযান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পক্ষে এই পাথেয়ই যথেষ্ট। সুট্‌কেস হইতে অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি বাহির করিয়া সে তাহাতে কয়েকখানি ধুতি ও কয়েকটি শার্ট-পাঞ্জাবি গুছাইয়া লইল। একখানা রাগ, একটা ছোট বালিশ ও একটি বিছানার চাদর সে তাড়াতাড়ি একসঙ্গে জড়াইয়া ফেলিল। দুই মিনিটের মধ্যে সে তাহার অন্যান্য জিনিসপত্র গুটাইয়া একপার্শ্বে জড় করিল।

গল্পটির প্রথম প্যারা শেষ করিয়া লেখক অক্ষয়কুমার একবার চকিত দৃষ্টিতে পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর ধীরে ধীরে অথচ স্পষ্টভাবে পড়িতে লাগিলেন, ভাষার গতি সহজ ও সরল হইয়াছে কি না! "গুটাইয়া একপার্শ্বে জড় করিল।"

মন্দ হয় নাই। প্রারম্ভই কৌতূহলোদ্দীপক। দ্বিতীয় প্যারা আরম্ভ করিলেন—

ওপারে রাস্তার উপর তখন দুইখানি ঘোড়ার গাড়িতে মালপত্র বোঝাই হইতেছিল। অতনু ত্রস্তপদে নীচে নামিল। সিঁড়িতেই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। কি, এত ব্যস্ত যে?

সহসা পশ্চাতের ঈষদুন্মুক্ত দরজা খুলিয়া গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমতী কমলা দেবী অক্ষয়কুমারের টেবিলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। লিখিত কাগজখানি চাপা দিয়া জিহ্বা ও দন্তের সহযোগে আকস্মিক কারণে সামান্যের জন্য ক্ষতি বা ব্যর্থতা সূচক শব্দ করিতে করিতে অক্ষয়কুমার কহিলেন, এমন সময়েও বাধা দিলে?

গম্ভীরভাবে কমলা দেবী কহিলেন, বলি, ছেলেটাকে কোথায় পাঠানো হচ্ছে, শুনি?

অক্ষয়কুমার বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, কাকে? কোন্ ছেলেটাকে?

কিছুই জান না বুঝি? ওই যে ওই অতনু। অতনু আবার নাম হয় নাকি?

কেন?

কেন কি আবার? তনু মানে কি? শরীর তো? তা হ'লে অতনুর মানে কি হয়? অশরীরী। অশরীরী বলতে কি বোঝ?

অশরীরী মানে তো ভূত।

তবে? যেমন লেখ, তেমনই তোমাদের পছন্দ!

অক্ষয়কুমার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, তোমার ভাষাজ্ঞান তো দেখছি খুব গভীর!

বটেই তো! আমার ভাষাজ্ঞান, না তোমার কল্পনাশক্তির বাহাদুরি! ভূত বানিয়ে নিয়েছ, নজরও পড়েছে। এইবার মেয়েটার ঘাড়ে লাগাতে পারলেই হয়। ছি ছি!

তুমি একটু থাম দেখি, সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যে! এই না নীচেয় কি করছিলে?

করছিলাম তো লক্ষ্মীপূজো। পূজো হয়ে গেছে, এখন প্রণাম করতে এসেছি।

অক্ষয়কুমার একটু হাসিয়া কহিলেন, প্রণামের মন্ত্রটা কিন্তু বড় কড়া। যাক, তা হ'লে আর দুপাতা লিখতে দাও এখন।

আচ্ছা, যাচ্ছি। কিন্তু আমার একটা কথার উত্তর দাও দেখি।

কি?

বলি, এই সব ছাইভস্ম ছাড়া কি গল্প আর নভেল হয় না?

ছাইভস্ম বলছ কাকে?

এই সব নোংরা প্রেম, হায় হায়, গেলাম, মলাম।

প্রেম কি কখনও নোংরা হয়? সে যে বরফের টুকরো। ওপরে ময়লা জমলেও গ'লে গিয়ে ভেতরের স্বচ্ছতা ফুটিয়ে তোলে।

শেষে গলতে গলতেই নিপাত হয়। একে কি বলে প্রেম? প্রেমের নিপাত নেই। মনের সঙ্গে মনের মিল আছে কিনা যে গুণ জানি না, স্বভাব জানি না, দেখলাম আর প্রেম করলাম। ঘটতেও দেরি লাগে না, চটতেও দেরি হয় না। এ প্রেম নয়, এ প্রেম নয়। যে জিনিসটা মানুষকে এতকাল পশু থেকে ওপরে রেখেছিল, এ ঠিক সেই জিনিসটারই বলিদান।

কিন্তু এই বলির প্রথা কি আজ নতুন?

নতুন বইকি! বিবাহিতা স্ত্রীকে দিয়ে কি প্রেম হয় না?

হয় বটে, তবে বৈচিত্র্যহীন। দেখ না, সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই সনাতন সত্যই চ'লে আসছে। যা দুষ্প্রাপ্য তাই পাবার প্রবল প্রচেষ্টা, যার ওপর দাবি নেই তাকেই দখল করবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা, যা নিষিদ্ধ তাই বিধিবদ্ধ ক'রে নেওয়া—এই হচ্ছে মানুষের স্বভাব। স্বকীয়ার প্রেম যতই মধুর হোক না কেন—মাদকতাশূন্য। তাই অনেক সময়ে কবিদের বাধ্য হয়ে স্বকীয়াকে পরকীয়ার মত দুষ্প্রাপ্য বানিয়ে নিয়ে প্রেমের অসীমতা দেখাতে হয়েছে। সেখানেই হচ্ছে নভেলের আর্ট।

এই আর্ট জিনিসটাকে কমলা কোনদিন বুঝিতে শিখেন নাই। তিনি বলিলেন, আর্ট কাকে বলে তা জানি না। কিন্তু একটা কথা বোধ হয় ভুলে যাচ্ছ তোমরা। নভেলের কৃতিত্বই হচ্ছে স্বাভাবিকের মধ্যে নতুনত্ব আনা। কিন্তু যে পরকীয়ার নোংরা প্রেমের মধ্য দিয়ে নতুনত্ব আনতে যাচ্ছ তোমরা, তা কি আর এখনও নতুন আছে? পরকীয়ার অবৈধ প্রেমের পরিণতি ষ্ট্রীকনাইন, পটাসিয়াম, না হয়

সলিল-সমাধি ; এই তো ! বছর বছর এর উদাহরণ তো একটি দুটি নয়। যেগুলি জানাজানি হয়ে পড়েছে সেইগুলিই মানুষে জানছে। তা ছাড়া সংযমহীনতার হাজার হাজার ঘটনা আমাদের এই দুর্ব্বল পীড়িত সমাজকে দিন দিন অন্তঃসারশূন্য ক'রে দিচ্ছে, তা কি একবারও ভাবছ না ? আর এই মারাত্মক বীজ ক্ষীণ সমাজের সর্ব্বাঙ্গে তোমরাই ছড়িয়ে দিচ্ছ এইসব যথেচ্ছচারিতায় সহানুভূতি দেখিয়ে—দূষিত নভেল আর টকি বায়স্কোপের সহায়তায়।

অক্ষয়কুমার কহিলেন, সব যদি মেনেও নিই, তবুও তোমার বোঝা উচিত যে বাজারে নাম করতে হ'লে এইসব ছাড়া উপায় নেই। ভাগবতের পাঠক এখন বিরল।

তার কারণ উপযুক্ত পাঠ্য-নভেলের অভাব, পাঠকের দুর্ভিক্ষ নয়। তোমাদের এই সব ছাইপাঁশ পড়ে কারা তা জান ? শতকরা নিরেনব্বই জন ছাত্রছাত্রী। সৎ কথা ব'লে তাদের তরুণ মনকে জয় করবার মত কলমের জোর নেই, তাই যত রাজ্যের কুকথা আর কুকাজ শিখিয়ে তাদের সরল মনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করছ! এ যেন ঠিক ন্যায়যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা নেই দেখে বিষাক্ত গ্যাসের সাহায্য নেওয়া! ছি ছি, জেনে শুনে এই পাপ কার্য্যের জন্যে কি তোমাদের একটুও মনস্তাপ হয় না ? আগাছা আর জঙ্গল দুনিয়াতে চিরদিনই আছে, চিরদিন থাকবে। ফসল উপেক্ষা ক'রে আগাছার চাষ পাগলেও তো করে না।

উত্তর দিবার মত অক্ষয়কুমারের কিছু ছিল কিনা সন্দেহ। আর থাকিলেও তিনি এই প্রসঙ্গ চাপা দিবার অভিপ্রায়ে কহিলেন, কথাও তো মন্দ জান না দেখছি! এই নাও, রেখে দিলাম। এত কষ্ট ক'রে প্লটটাকে সাজিয়ে নিয়েছিলাম, তার একেবারে পিণ্ডি চটকে দিলে!

ভাল কথাই বলছিলাম, কিন্তু বিরক্ত হচ্ছ যখন আর বলব না। তবে মনে রেখ, যে বিষ ছড়াচ্ছ তার জ্বালায় নিজেদেরও জলতে হবে। এইসব চিন্তাধারা সংক্রামক ব্যাধির মত পুরুষানুক্রমে ছড়িয়ে পড়বে।

অক্ষয়কুমার কহিলেন, দেখ কমলা, রোমান্স বলতে যে জিনিসটা, তা কি তোমার মধ্যে নেই ?

ধরা দিয়ে ফেলেছি যে, থাকবে কি ক'রে ? ফিরে জন্মে চেষ্টা করব।

কমলা দেবী প্রস্থান করিলেন।

অক্ষয়কুমার কলম তুলিয়া লইলেন এবং ভাবিয়া চিন্তিয়া দ্বিতীয় প্যারা বাতিল করিলেন। পুনরায় কলম চলিল।

অতন্থু ভাবিল তাহাতেই বা লাভ কি ? কোথায়, কোন্ দেশে, কতদূরে অনুসরণ করিব ? তবে গন্তব্য স্থানটি জানিয়া রাখা দরকার। যদি সম্ভব হয়—

অতন্থু নীচে আসিয়া দেখিল, গাড়ি দুইখানি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিছুদূর সঙ্গে সঙ্গে ত্রস্তপদে চলিয়া একখানি খালি গাড়ি পাইয়াই সে চড়িয়া বসিল। গাড়োয়ান জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যেতে হবে বাবু ?

ওই আগের গাড়ির সঙ্গে।

ভাড়া ?

সেজন্যে চিন্তা নেই।

গাড়োয়ান ব্যাপারটি পরিষ্কার বুঝিতে না পারিলেও যতটা অনুমান

করিল, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া অগ্রবর্ত্তী গাড়ি দুইখানির অনুগমন করিতে লাগিল।

কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া বরাবর গাড়ি দুইখানি হ্যারিসন রোড অতিক্রম করিয়া কলেজ ষ্ট্রীটে পড়িল। নূতন আশায় অতনু সজীব হইয়া উঠিল। শিয়ালদহও নয়, হাওড়াও নয়। অদৃষ্ট তবে সত্যই সুপ্রসন্ন।

ক্রমে কলেজ ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা, চৌরঙ্গী একে একে অতিক্রম করিয়া তাহারা বরাবর ভবানীপুর অভিমুখে চলিল। এ তবে বাসা-বদল ব্যতীত আর কিছুই নয়। অতনু ভাবিতেছিল, তরুণী কি নিষ্ঠুর! এ বাসা বদলের কি প্রয়োজন ছিল তাহাদের? এই যে দীর্ঘ তিন মাস সে নীরবে ওই তরুণীর উপাসনা করিয়া আসিয়াছে, তাহার নির্নিমেষ চক্ষু দুইটি বাতায়নের পর্দ্দাখানিকে উপেক্ষা করিয়া যে প্রতিক্ষণে রন্ধ্র ও ছিদ্র অবলম্বনে তাহার অভিপ্সিতার চরণে হৃদয়ের প্রেমার্ঘ্য দান করিয়াছে, সে কি তাহা দেখিয়াও দেখে নাই? অবশ্যই দেখিয়াছে, অবশ্যই বুঝিয়াছে। তাহার লুব্ধ দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া চকিতে কতবার সে ফিরিয়া চাহিয়াছে। কটাক্ষের হিল্লোল আলোকে বাতাসে লহর তুলিয়া হৃদয়ের তারে ঝঙ্কার তুলিয়াছে। তবে? তবে নিঃসন্দেহ এই বাসা-বদল ব্যাপারে তরুণী নিষ্পাপ। সে কখনও স্বেচ্ছায় তাহার ভক্তের প্রতিষ্ঠিত আসন ত্যাগ করিয়া যাইতেছে না। তরুণীর অভিভাবক ওই নীরস প্রৌঢ়ই এই পাপের জন্য দায়ী। উনবিংশ শতাব্দীতে যাহার জন্ম, বিংশ শতাব্দীর তরুণ-তরুণীর মনোবৃত্তি সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা থাকা সম্ভব নয়। অনভিজ্ঞের অভিভাবকত্বের ফল সাংঘাতিক।

সহসা চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। গাড়ি থামাইয়া গাড়োয়ান বলিল, আগের গাড়ি তো থেমে গেল?

বাস্, আমিও এখানেই নামব।—বলিতে বলিতে অতনু গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল, এবং তিনটি টাকা বাহির করিয়া গাড়োয়ানের হাতে দিল। গাড়োয়ান অতনুর মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। তার-পর, 'সেলাম হুজুর' বলিয়া ঘোড়ার রাশ ধরিল।

রাস্তার যে পাশে গাড়ি দুইখানি দাঁড়াইয়া ছিল তাহার বিপরীত দিকে একটি চায়ের দোকান দেখিয়া অতনু চট করিয়া সেই দোকানের মধ্যে উঠিয়া বসিল। স্থানটি, —মুখার্জির রোড। অতনু স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল, চাকরেরা জিনিসপত্র নামাইয়া লইতেছে। তরুণী ও অন্যান্য সকলে একে একে নামিয়া গেল। দরজায় মহিলারা তাহাদের অভ্যর্থনা করিয়া লইল।

অতনু নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। প্রাণহীন মেসে সে আর থাকিতে পারিবে না। কি লইয়া বাঁচিবে সে? চা খাইতে খাইতে সে জিজ্ঞাসা করিল, ধারে কাছে কোথাও ভাল মেস আছে?

চা-ওয়ালা উত্তর করিল, এই দোকানের ওপরেই তো বোর্ডিং।

সোৎসাহে অতনু প্রশ্ন করিল, সীট খালি আছে?

হ্যাঁ, সামনের ঘরখানি খালি আছে। ভাড়া বেশি ব'লে মেম্বার হয় না। ওপরে গেলেই খবর পাবেন।

দ্বিরুক্তি না করিয়া অতনু উপরে উঠিয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রফুল্লমুখে নামিয়া আসিল। চা-ওয়ালা জিজ্ঞাসা করিল, ঠিক ক'রে এলেন? কখন আসছেন?

হ্যাঁ, কালই আসছি। তবে এক বছরের এগ্রিমেণ্ট দিতে হ'ল।

পদ্মপুকুরের মোড়ে আসিয়া অতনু বাসে চাপিয়া বসিল। আধ-ঘণ্টার মধ্যে মেসে ফিরিয়া আসিল। মনে তাহার স্বস্তি ছিল না। জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ওপাশের শূন্য বাড়িখানির দিকে তাকাইয়া

সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। রাস্তায় জনস্রোতের অবিরাম গতি, গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ, মোটরের হর্ন, ফেরিওয়ালার চীৎকার কিছুই তাহার শ্রবণ ও দর্শনেন্দ্রিয়ের গোচরীভূত হইতেছিল না। কি সুন্দর সেই চাহনি! কি সুপুষ্ট সুঠাম দেহে যৌবনের নব জাগরণ! প্রতি ভঙ্গিতে ছন্দ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠে, প্রতি অঙ্গ-সঞ্চালনে যেন বসন্তের শিহরণ জাগাইয়া তুলে। এই রূপতৃষ্ণাই তো গোবিন্দলালকে দেশত্যাগী করিয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণকে বাঁশী বাজাইতে শিখাইয়াছিল, স্বয়ং মহাদেবকে ক্ষিপ্ত করিয়া মোহিনী মূর্ত্তির পশ্চাতে ছুটাইয়াছিল। তবে? সেও তো রক্তমাংসের মানুষ। যার জন্য ট্রয় ধ্বংস হইয়াছে, চিতোর পুড়িয়াছে, বিচারক আসামী সাজিয়াছে, রাজা রাজ্য ছাড়িয়াছে, সে কি একটা মেসও ছাড়িতে পারিবে না?

ম্যানেজারের যথেষ্ট অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, অগ্রিম টাকা লোকসান দিয়া অতনু পরদিন সকালেই তাহার পুরাতন মেস পরিত্যাগ করিয়া নূতন বাসায় চলিয়া গেল।

সেখানেও সে জানালার কাছে বসিয়া থাকে। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহার আশা সফল হইল না। ফল্গুনদীর ন্যায় ভিতরে স্নিগ্ধ প্রস্রবন লুকাইয়া রাখিয়া ওপারের বাড়িখানির বাহ্যিক নীরব নীরসতার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইল না। সদর বারান্দায় দুইজন সিপাহী-জাতীয় পশ্চিমা সর্ব্বদাই বসিয়া থাকে। অতনু অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল।

একখানি খবরের কাগজ লইয়া সেদিন সে জানালার ধারে বসিয়া ছিল। দেশের কথা বা দশের কথা জানিবার বা বুঝিবার তাহার ইচ্ছাও ছিল না, অবসরও ছিল না। অন্যমনস্কভাবে সে বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায় চক্ষু বুলাইতেছিল। Wanted Column-এর উপর নজর পড়িতেই

সে দেখিতে পাইল—Wanted a private tutor for a girl of I. A. Class. ঠিকানা —মুখার্জির রোড। অতনু চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠিল। সাধনায় সিদ্ধি। Will force! Will force ছাড়া আর কিছুই নয়। ভাগ্য তাহার অনুকূল। প্রশংসার সঙ্গে বি. এ. উত্তীর্ণ হইয়াছে সে, ল-টাও এবারে পাস করিয়াছে। আপাতত তাহার রোজগারেরও প্রয়োজন নাই। এইবার সুবর্ণ-সুযোগ!

নির্দ্দিষ্ট সময়ে যথারীতি প্রস্তুত হইয়া অতনু সম্মুখস্থ বাড়ির দরজায় গিয়া উপস্থিত হইল।

ঘড়ির দিকে চাহিয়া অক্ষয়কুমার দেখিলেন দশটা। আর দেরি করা চলে না। গল্পটি জমিয়া আসিয়াছিল, কলমও দ্রুত চলিতেছিল, কিন্তু উপায় নাই। অতনুকে দরজায় রাখিয়া অগত্যা তাঁহাকে উঠিতে হইল।

কমলা দেবী কহিলেন, উঠলে যে বড়? মনে করেছিলাম, আজ ডাকব না। অতনুকে স্বর্গের দরজায় পৌঁছে দিতে পেরেছ তো?

অক্ষয়কুমার হাসিতে হাসিতে কহিলেন, দরজা অবধি পৌঁছেছে বটে; কিন্তু অল্পের জন্য বেধে গেল।

সবেমাত্র কয়েক মাস হইল অক্ষয়কুমার কোন এক কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ছাত্র-জীবনের শেষ ভাগ হইতে তাঁহার লিখিবার নেশা জন্মিয়াছিল, এবং খাতায় বিশ ত্রিশটা গল্পও মজুত হইয়াছিল। কিন্তু কয়েকটি ব্যতীত সবগুলিরই পাঠক পাঠিকার সংখ্যা তদবধি একমাত্র কমলা দেবীতে আবদ্ধ ছিল। কমলা দেবীর পিতা কাশীতে হিন্দু ইউনিভার্সিটির সংস্কৃতের অধ্যাপক। বাড়িতে

পড়িয়াই কমলা দেবী প্রবেশিকা-পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। অক্ষয়কুমারের গল্পের অধিকাংশ প্লটই কমলা দেবীর ভাল লাগিত না, এবং সেই প্রসঙ্গে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই বাদ-প্রতিবাদ চলিত।

স্বামীর আর্ট-জ্ঞানের মাত্রা ক্রমশই বাড়িয়া চলিয়াছে দেখিয়া তিনি আজ এক নূতন পন্থা অবলম্বন করিতে মনস্থ করিলেন।

তাড়াতাড়ি আহারাদি সমাপ্ত করিয়া কমলা দেবী লেখক স্বামীর টেবিলে গিয়া বসিলেন। অসমাপ্ত গল্পটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া কলম হাতে লইলেন এবং লিখিয়া যাইতে লাগিলেন।

বৈকালে কলেজ হইতে ফিরিয়া জলযোগ সমাপ্ত করিয়া অক্ষয়কুমার বেড়াইতে বাহির হইলেন। কিছুক্ষণ ঘুরিয়া আসিয়া সন্ধ্যার পর যথাসময়ে লিখিবার টেবিলে গিয়া বসিলেন। গল্পগুলি প্রথমত আলগা কাগজে লেখা হইয়া পরে পাকা খাতায় উঠিত। রাশি রাশি ফুলস্কেপ কাগজ ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে অক্ষয়কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, গল্প? আমার গল্প?

কমলা দেবী পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, বলিলেন, কোন্ গল্প?

সকালের সেই অতনু—অতনু?

ধীরভাবে কমলা দেবী উত্তর করিলেন, অতনুর আমি ব্যবস্থা করেছি।

ব্যবস্থা করেছ কি গো?

ভয় নেই, কিছু অনিষ্ট করি নি। অতনু জীবিতই আছে।

ভয়ানক অস্থিরতার সঙ্গে অক্ষয়কুমার কহিলেন, কি মুস্কিল! তোমায় মিনতি করছি, দাও না গল্পটা।

থাকলে তো দোব!

কি কঠিন লোক তুমি! কি করেছ কিছুতেই বলবে না?

এতই ভাল লেগেছিল আমার যে তোমার আসা অবধি আর অপেক্ষা করতে না পেরে—

অক্ষয়কুমারের সংশয় ও অস্থিরতা আরও বাড়িয়া গেল।

কি করেছ, বল না! উঃ, তুমি কি ভীষণ mischievous!

অধীর হচ্ছ কেন, কোন mischief করি নি তোমার। আগামী মাসেই তোমার অতনু সাধারণের সম্মুখে প্রকট হয়ে পড়বে।

অক্ষয়কুমার স্থির নীরব।

কমলা দেবীর শত সহস্র শপথেও তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিলেন না যে কমলা সত্যই তাহার অতনুর বিলোপ সাধন করেন নাই।

কমলা দেবী দুঃখিত হইয়া অনুযোগের স্বরে কহিলেন, আমি কি শপথ ক'রে মিথ্যা বলছি?

নিতান্ত নির্লিপ্তভাবে হতাশ অক্ষয়কুমার উত্তর করিলেন, তা জানি না। তবে ষ্ট্রীক্‌নাইন, পটাসিয়াম বা সলিল-সমাধিতে অতনুর মৃত্যু না থাকলেও মহাদেবের নয়নাগ্নির ন্যায় তোমার উনুনের আগুনে নিশ্চয়ই ভস্মীভূত হয়েছে। তাকে বাঁচাতে হ'লে বহু সাধনার প্রয়োজন।

অতিকষ্টে হাসি চাপিয়া কমলা নিরুত্তর রহিলেন।

দুই চারি দিনের মধ্যে অক্ষয়কুমার অতনুর শোক বিস্মৃত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ড্রয়ারে চাবি পড়িল। কমলা দেবীকে তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে, নিজের যথাসর্ব্বস্ব এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত তিনি অবলীলাক্রমে তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার novelty এবং art-কে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অতঃপর যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে।

কমলা দেবী এবিষয়ে বিন্দুমাত্রও আপত্তি করিলেন না।

এক মাস কাটিয়া গিয়াছে। কলেজ হইতে ফিরিয়া জামা কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে অক্ষয়কুমার দেখিতে পাইলেন, তাঁহার টেবিলের উপর একখানি সদ্যপ্রকাশিত—।

কৌতূহলবশত সেখানি হাতে লইয়া পাতা উল্টাইতেই চোখে পড়িল—'অতনুর পুনর্জন্ম। লেখক—শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় এম. এ.।'

এ নিশ্চয়ই কমলার কাজ। কি ভয়ানক daring!

কমলা পূর্ব্বেই সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিলেন।

অতনুর শেষ পরিণতি দেখিবার জন্য অক্ষয়কুমার মহা আগ্রহে যেখানে তাহাকে হারাইয়াছিলেন রুদ্ধশ্বাসে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বারান্দার সিঁড়িতে পা দিতেই একজন পশ্চিমা রূঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ক্যা মাঙতা হ্যায় সাব?

অতনু চমকিয়া থামিয়া গেল। সে ধীরে ধীরে বলিল, হিঁয়া একঠো মাষ্টারি—

মাষ্টা—রি! কৌন্ মা—ষ্টারি? ক্যা বোল্‌তা হ্যায় তুম্?

অতনু ভয়ে ভয়ে কহিল, কাগজমে লিখ্‌খা হ্যায়—

অতনুর অবস্থা দেখিয়া পশ্চিমা দুই জন পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিয়া একটু হাসিল। পরে একজন প্রভুত্বব্যঞ্জক স্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, ক্যা নাম হ্যায় আপ্‌কা?

অতনু অধিকারী বি. এল.।

পশ্চিমারা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অতনু বিমূঢ়—নির্ব্বাক।

এঃ, এ বয়েলবাবু, বাড়িকা কেততো নম্বর আছে ?

লজ্জায় ম্রিয়মান অতনু উত্তর করিল, ৪৮৪ নম্বর।

বাস্? এহি তো 'পি' নম্বরওয়ালা বাড়ি আছে। আই. বি. অফসারকা কুঠ্ঠি, তুমারা মালুম নেই হ্যায়? ভাগো হিঁয়াসে, জলদি ভাগো।

কাল বিলম্ব না করিয়া অতনু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল। পশ্চাতে সিপাহী-দের অভিমত শুনা গেল, আচ্ছা বেকুব আদমি হ্যায়।

লজ্জায় ঘৃণায় অতনু শুকাইয়া গেল। কয়েক দিন সে আর জানালা খুলিল না, বেড়াইতেও বাহির হইল না। ঘরে শুইয়াই কাটাইয়া দিল।

স্মৃতি কিছুতেই লুপ্ত হয় না। নিরবচ্ছিন্ন নির্জ্জনতাও ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। একদিন সে ট্রামে করিয়া তাহার পুরাতন মেসে বেড়াইতে গেল।

এই যে, অতনুবাবু যে! কেমন আছেন?

ভাল নয়।

তাই তো দেখছি। কদিনেই যে শরীর একেবারে শুকিয়ে গেছে। অসুখ করেছিল নাকি ?

অতনু বলিল, অসুখ! বেশ ভালরকমই অ-সুখ।

চোখ দুইটি তাহার আপনা হইতেই ওপাশের সেই চিরপরিচিত বাড়িখানির মুক্ত জানালার উপর গিয়া পড়িল। একি, কি এ! স্বপ্ন, না, সত্য! সত্যই তো!

ধীরে ধীরে পর্দ্দার আবরণ দৃষ্টি প্রতিহত করিল।

ম্যানেজার অন্য দিকে ফিরিয়া কথা কহিতেছিলেন। অতনুর ভাবান্তর তিনি লক্ষ্য করিলেন না। অতনু জিজ্ঞাসা করিল, ওই সামনের বাড়িটা ভাড়া হয়ে গেছে?

ওটা তো ভাড়াটে বাড়ি নয়।

তবে?

ওটা হচ্ছে রিটায়ার্ড পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জীবনবাবুর নিজের বাড়ি।

রুদ্ধনিশ্বাসে অতনু কহিল, মাঝে মাঝে খালি দেখা যায় যে?

ও, ওঁর শ্বশুরবাড়ি ভবানীপুরে। কোথায় যেন কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে, মাঝে মাঝে সেখানে দেখাশুনা করতে যান। তখন মেয়েদের ভবানীপুরে রেখে যান। ভদ্রলোকের ছেলে নেই।

অতিকষ্টে নিজেকে সংযত করিয়া অতনু জিজ্ঞাসা করিল, আমার ঘরটা কি খালি?

না, আপনি যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক পণ্ডিতমশায় কায়েমিভাবেই দখল করেছেন।

অতনু আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেছিল না। দরজার পাশে মরিচা-ধরা লোহার চেয়ারখানিতে সে বসিয়া পড়িল।

ঠিক ঠিক, একখানা চিঠি আছে আপনার।

অতনু চিঠিখানি লইয়া পকেটে পুরিল।

ট্রামে চাপিয়া অতনু শেষ বেঞ্চের এক কোণ ঘেঁষিয়া বসিল। চিঠিতে পিতার হস্তাক্ষর। পকেট হইতে বাহির করিয়া সে চিঠিখানি খুলিয়া ফেলিল। পড়িতে পড়িতে সে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া গেল।

"তোমার বিবাহের সম্বন্ধ একরূপ পাকাপাকিই হইয়াছে বলা যায়। পাত্রীর পিতা আমার বাল্যবন্ধু, রিটায়ার্ড পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

তোমার মেসের নিকটেই মনে হয় তিনি বাড়ি করিয়াছেন। কলিকাতাতেই তোমার সঙ্গে তাঁহার দেখা হইবে।"

ট্রাম কোন্‌পথে কোথায় চলিয়াছে, কতবার সে চিঠিখানি পড়িয়াছে—অতনু কিছুই জানে না।

একবার টিকিট কিনিয়াছে, আবার টিকিট কি! চমক ভাঙিয়া গেল।

অতনু চাহিয়া দেখিল যেখান হইতে সে ট্রামে চাপিয়াছিল প্রায় সেইখানেই সে রহিয়া গিয়াছে এবং ট্রামখানাও উল্টামুখে ঘুরিয়া গিয়াছে।

ব্যাধিমুক্ত অতনু দুই হাতে চক্ষু মুছিয়া সোজা হইয়া বসিল।

একনিশ্বাসে গল্পটি শেষ করিয়া অক্ষয়কুমার ডাকিলেন, কমলা, কমলা!

কি, এই যে।

এই নাও আমার ড্রয়ারের চাবি।

বাঙালের দৌরাত্ম্য

গল্প নয়, নিছক সত্য ঘটনা।

রাতের ট্রেন। যশোর থেকে কলকাতায় যাব। ষ্টেশনে এসে দেখি ভীষণ ভিড়। তখন মনে হ'ল যে পরদিন গঙ্গাস্নানের যোগ। এ গাড়িতে এসে ভুল করেছি। ঘুমিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, দাঁড়াবার স্থান পেলেই যথেষ্ট। যাক, এসে পড়েছি যখন, তখন যেতেই হবে। ইণ্টারক্লাসের একখানি টিকিট নিয়ে তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফরমে এসে দাঁড়াতেই ট্রেন এল। উঠে দেখি 'ন স্থানঃ তিল ধারণে'। সব কখানি বেঞ্চই ভর্ত্তি। অধিকন্তু উপরে নীচে নানাবিধ মালপত্রে একেবারে বোঝাই। আরোহীদের মধ্যে একজন ব'লে উঠলেন, মশায়, অন্য গাড়ি দেখলে হ'ত না? অন্ধকূপ-হত্যা করবে নাকি? অপর একজন বললেন, কি আপদ! যত লোক সব যেন একজোট ক'রে ছিল যে এই গাড়িতেই উঠবে। থাক বাবা, এখন সারারাত দাঁড়িয়ে। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি গম্ভীরভাবে বললেন, দেখুন, গাড়ি ছাড়বার এখনও দেরি আছে, ঐ আগের দিকের গাড়ি দেখুন, অনেক জায়গা আছে। তাঁকে সমর্থন ক'রে আর একজন বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, সামনের দিকে ঢের গাড়ি খালি রয়েছে। রেলযাত্রীদের স্বভাব আমার বিলক্ষণ জানা ছিল। তাদের নিজেদের গাড়িখানি ছাড়া আর সব গাড়িই বরাবর খালিই

গিয়ে থাকে। উত্তর যথেষ্টই জানা ছিল। কিন্তু তাতে লাভের চেয়ে লোকসানের সম্ভাবনাই বেশি বুঝে কথাবার্ত্তা না ব'লে একটু বসবার স্থান ক'রে নেবার চেষ্টা করছিলাম। একটি বৃদ্ধ ও জনৈক পরিচ্ছদপ্রিয় ভদ্রলোক একপাশে বসেছিলেন। বৃদ্ধটির সহ্যগুণ এবং সহানুভূতি কিছু অনন্যসাধারণ মনে হ'ল। তিনি তাঁর নানাজাতীয় দ্রব্যসম্ভার সরিয়ে গুছিয়ে আমাকে বসবাব মত একটু জায়গা ক'বে দিলেন। স্থান পেয়ে বৃদ্ধকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। আমার কৃতজ্ঞতার কথা শুনে বৃদ্ধ বললেন, হঃ, বা-রী কাজ কোরছি! হগ্‌গলেই পয়সা দিছি, হগ্‌গলেই মিলা মিশাই জাইমু, ইয়াতে আর কথা কি?

আমি বললাম, সে কথা সবাই বোঝে কই!

বৃদ্ধ উত্তর করলেন, বোঝে না জন্তুতে, মানুষের তো বোঝনের কথা।

পার্শ্বস্থ ভদ্রলোকটির মুখেব দিকে চেয়ে বুঝতে পারছিলাম যে এই নবাগতের অত্যাচার তাঁর পক্ষে মোটেই প্রীতিকর হয় নি।

বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন, আপ্‌নে যাবেন কোই?

আমি বললাম, কলকাতায়।

কলিকাতা? কোন্ হানে যাইবেন?

ভবানীপুরে।

ববানীপুরে? তয় তো বালোই হইছে। ববানীপুরে কোন্ গলিতে যাইবেন?

বেলতলা।

বাচ্‌ছি। সঙ্গী পাইছি। পোলাগোরে তো লিখছি। কেউ যদি ইষ্টিশনে না আয়, দুই জনে একহান গারী কইর‍্যা যামু আনে।

কলিকাতা জায়গা যত হ্যাশের ঠগী বাটপারী বাসা বাধছে। পথে-ঘাটে একটা সামগ্রী টান দিয়া লইলেই হইলে। এ তো আর আমাগোর বরিশাল না।

আমি বললাম, তা বেশ, আপনার সঙ্গে অনেক জিনিসপত্তর আছে বুঝি?

এমন আর কি সামগ্রাই বা আনছি! তবে হঃ, এই পোলাপানগোর লাইগ্যা এক পাতিল গুর আনছি, গোডাদুই খই আনছি, গোডাকত নারিকেল আনছি। একহান বডী যে আনছি—কলিকাতায় ইয়ার মূল্য হইতে পাচসিকা। আনছি কতোয় জানেন নি? ছয় আনায়। শহরে হগ্‌গল দ্রব্যই দুর্ম্মূল্য! ঝাডার কাডিডাও তো জানেন কেনতে হয়! কয়গাছ ঝাডাও আনছি। বউমা হ্যাশের পাতিলের প্রশংসা করছিল, তা বেশি তো আনোন যায় না, একটা পাতিল আনছি। আনাজটা আস্‌ডা বাজার থনে আনোনের লাইগ্যা দুইডা চুপরি আনছি।

পাশের ভদ্রলোকটির চোখে চশমা; নূতন ধোপভাঙা মিহি ধুতি, পাম্পসু ও আদ্দির পাঞ্জাবিতে দেহখানি সুসজ্জিত। অতিরিক্ত সান্নিধ্যবশত অপরাপর যাত্রীদিগের গাত্রঘর্ষণের অত্যাচার থেকে স্বীয় পরিচ্ছদের সৌষ্ঠব অমলিন রাখবার জন্য তিনি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর সন্দিগ্ধ চক্ষু দুটি সর্ব্বদাই এই অবিবেচক বৃদ্ধের প্রতি প্রহরী ছিল। এই পরম অশান্তিদায়ক বৃদ্ধের উপর রোষ ও বিতৃষ্ণা তাঁর মুখের ভাবভঙ্গিতেই স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল। ভদ্রলোকটি আর ধৈর্য্য ধারণ করতে পারলেন না। বৃদ্ধের কথা ফুরাবার আগেই তিনি ব'লে উঠলেন, ঝুড়ি কতক মাটি নিয়ে এলেন না কেন মশাই? সেগুলিও তো কলকাতায় পয়সা দিয়ে কিনতে হয়।

বৃদ্ধ অতি সহজভাবে বললেন, হঃ, আনতে পারলে তো বালোই অইতে, কিন্তু মাশুলে পোষায় কই !

বৃদ্ধের এই স্বচ্ছন্দ সরলতায় ভদ্রলোকটির বিরক্তি যেন আরও তীব্রতর হয়ে উঠল। তিনি আমার দিকে ফিরে বললেন, দেখছেন মশাই, কি রকম ন্যাইস্যান্স। ইণ্টারক্লাসেও আর এই সব বাঙালের জন্যে চলবার উপায় নেই। কোথা থেকে যত সব রাজ্যের রাবিশ কুড়িয়ে এনে গাড়িখানাকে বোঝাই ক'রে রেখেছে।

আমি বললাম, কি করবেন বলুন ? পথে-ঘাটে পাঁচরকম লোক নিয়ে তো চলতেই হবে, তার আর উপায় কি ?

বলেন কি মশায়, উপায় নেই কি ? এসব অব্‌জেক্‌শনেব্‌ল মোটঘাট নিয়ে এদের থার্ডক্লাসে যাওয়া উচিত নয় ? আমার তো মনে হয়, এ বিষয়ে একটা রিজোলিউশন করা দরকার। অন্য প্যাসেঞ্জাররা এসব না-ও অ্যালাউ করতে পারে, তাতে তাদের দোষ দেওয়া চলে না।

আমি কথা কইবার আগেই বৃদ্ধ নির্ব্বিকারভাবে বললেন, ইয়ার্ আর করমু কি কন ? আবশ্যকীয় দ্রব্য ফেইল্যা দেওন তো যায় না ! আর বিষয়ডাই বা কি ? কলের গারি তো উরিয়াই চলছে। একটা রাত যেমন তেমন কইর্যা কাডাইয়া দিমু আনে। আনছি যহন তহন রাখমু কোই ?

ভদ্রলোকটি বললেন, রাখবেন আর কোথায়, এই তো আমাদের মাথার ওপর চাপিয়ে রেখেছেন ! আচ্ছা মজার লোক যা হোক !

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিলেন না, ফর্দ্দের সঙ্গে মিলিয়ে গাড়ির ঝাঁকুনিতে স্থানচ্যুত দ্রব্যগুলিকে অতি সাবধানে একে একে যথাস্থানে রেখে বেঞ্চের তলা থেকে একটা হুঁকো, একটু তামাক ও খানিকটা

নারিকেলের ছোবড়া বার ক'রে নিতান্ত নির্ব্বিকারভাবে ভদ্রলোকটিকে বললেন, মশায়, আপনার দিয়াবাতিডা একবার দিবেন নাকি ?

অনুপম মুখভঙ্গি সহকারে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন, না মশায়, আমার দেশলাই নেই।

বৃদ্ধ বললেন, এইডা কি কন ? এই যে দ্যাখতে আছি খচখচ কইর‍্যা টাকাইয়া বিড়ি খাইতে আছেন। হিংসা করেন কিয়া ? একগো কাডিতেই এত মমতা হইলে ! পরে আমার দিকে ফিরে বললেন, হ্যায়ছেন নি তামসা !

নাসিকাকে যথাসম্ভব কুঞ্চিত ক'রে ভদ্রলোকটি বললেন, কি বিপদেই পড়েছি ! এই নিন দেশলাই, কিন্তু ঐ নারকোলের ছোবড়া স'রে গিয়ে জ্বালাবেন।

বৃদ্ধ দেশলাই নিয়ে বললেন, হরমু বা কোই ; স্থান থাকলে তো অইতেই।

নিরুপায় ভদ্রলোক নাকে মুখে রুমাল চেপে আমার দিকে ফিরে বসলেন। বৃদ্ধ তামাকে আগুন দিয়ে কলিকাটিকে হুঁকার উপর চড়িয়ে অর্দ্ধনিমীলিতনেত্রে মহানন্দে ধূমপানে রত হলেন। ন্যূনপক্ষে অর্দ্ধশতাব্দীর অভ্যাসের ফলে ধূমপানে বৃদ্ধের পারদর্শিতা অত্যল্প কালের মধ্যেই প্রকাশ হয়ে পড়ল। দেখতে দেখতে গাড়িখানি ধূমে একেবারে অন্ধকার হয়ে উঠল। ও পাশের বেঞ্চ থেকে এক ভদ্রলোক ব'লে উঠলেন, ও মশায়, ওধারে কোন গাঁটরি-বুচকিতে আগুন ধরেছে নাকি ? এ যে বিষম কাণ্ড !

পার্শ্বস্থিত ভদ্রলোকটি অতি দ্রুত মুখের সামনে রুমাল নাড়তে নাড়তে বললেন, কি মশায়, আপনার তামাক খাওয়া হ'ল ? আপনি দেখছি গাড়িসুদ্ধ লোককে উত্যক্ত ক'রে তুললেন।

এই অইলে। আমিও কি কম যন্তন্নায় ঠেকছি।—ব'লে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে বৃদ্ধ ধূমপানে বিরত হলেন।

স্বীয় দ্রব্যাদি পুনরায় সাবধান ক'রে বৃদ্ধ কলাপাতায় মোড়া কিছু ছেঁচা পান দন্তবিহীন মুখে পুরে চিবোতে লাগলেন। কিছুক্ষণ একরকম বেশ কেটে গেল। কিন্তু গাড়ি বনগ্রামে পৌছতেই আবার একটা অসম্ভব ভিড় হয়ে উঠল। নিতান্ত অসম্ভব বিধায় আমাদের গাড়িতে আর কোন নূতন যাত্রীর সমাগম হ'ল না। ষ্টেশনে পান বিড়ি ও খাবারওয়ালাদের চীৎকারে ও যাত্রীদিগের কোলাহলে মাথা ধ'রে যাচ্ছিল। যশোরবাসী জনৈক ভদ্রলোক গাড়ির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চীৎকার ক'রে ছুটে বেড়াচ্ছিলেন, রাজেন্দোর! ও—ও—ও রাজেন্দোর, আবে গেলে কনে? ধুত্তুরি ছাই এহনি তো গাড়ি ছাড়ে দেবানে। এত ভিড়ির মধ্যি,—ও রাজেন্দোর!

এ আইল আবার কোন্ ইষ্টিশনে।—ব'লে বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠে পূর্ব্বোক্ত ভদ্রলোকটির কাঁধের উপর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ষ্টেশনের দৃশ্যটি দেখবার চেষ্টা করছিলেন। ভদ্রলোকটি নিতান্ত ক্রোধবিরক্তি-মিশ্রিত স্বরে ব'লে উঠলেন, নাঃ, একি যন্ত্রণা! একেই তো এত ভিড়, তার ওপর দেখছি আপনি একেবারে ঘাড়ের ওপর চ'ড়ে বসলেন।

বৃদ্ধ বললেন, ঘাড়ে চড়মু ক্যান, আপনি তো আর চতুষ্পদ নন যে সোয়ার হইমু। এক নজর ইষ্টিশেনডার শোবা খ্যাখতে আছি, ইয়াতেই এককালে চডিয়া অস্থির!

ভদ্রলোকটি বললেন, বুড়ো হ'লে কি হয়, রসিকতাও তো বিলক্ষণ আছে দেখছি!

পূর্ব্ব থেকেই বৃদ্ধের হাঁচির উদ্রেক হয়েছে। এই সময়ে আর সামলাতে না পেরে সশব্দে ভদ্রলোকটির মুখের উপরে হেঁচে

ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দন্তবিহীন মুখ থেকে চর্ব্বিত তাম্বুল-কণা বিনির্গত হ'য়ে ভদ্রলোকের মুখে চোখে ও পরিধেয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

আরে ছি ছি ছি, এ কি রকম কাণ্ড মশায়! এ কি মানুষ!—বলতে বলতেই ভদ্রলোক একলম্ফে উঠে দাঁড়ালেন। পরে অনুযোগ ক'রে আমাকে বললেন, দেখুন তো মশায়, কতকগুলো পান খেয়ে কি ক'রে আমার জামা কাপড়গুলো নষ্ট ক'রে দিলে! মুখে তো দাঁত নেই, তবু জাবর কাটবার কামাই নেই! এমন একটা ইডিয়টের কাছে ব'সে কি ঝকমারিই করেছি!

বৃদ্ধ বললেন, আরে, রাগ করেন ক্যান মশায়, দন্ত নাই বলিয়া কি পান খাওনে নিষেধ আছে? অত চডেন কিয়া। পিরানডায় নয় কিঞ্চিৎ দাগই লাগছে। ধুইয়া ফ্যাললেই যাইবে গিয়া। চিরিও নাই, ফাডাইও নাই।

জনৈক যাত্রী বললেন, চেপে যান মশায়, চেপে যান। বুড়ো মানুষ, না হয় লেগেছেই একটু দাগ। চেঁচিয়ে তো আর কোন লাভ হবে না।

ভদ্রলোক আর করেন কি! পাঁচজনের কথায় থেমে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছিল যে, পারেন তো তিনি এক চপেটাঘাতে বৃদ্ধের তাম্বুল-চর্ব্বণ-স্পৃহা চিরদিনের মত মিটিয়ে দেন।

কিছুক্ষণ আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল না। আমি পরিচয় নিয়ে জানলাম যে ভদ্রলোকটির বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে, কলিকাতায় কোন ওয়ার্ড ষ্টেটে চাকুরি করেন। শনিবারে খুলনায় তাঁর মামাশ্বশুর বাড়িতে প্রিয়া-সন্দর্শনে এসেছিলেন, এবং ট্রেন থেকে নেমেই তাঁকে বরাবর আপিসে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে। ভদ্রলোকটি একটু বাবু-গোছের লোক। বৃদ্ধনিক্ষিপ্ত তাম্বুল-রসের আক্রমণ তাঁর

মুখের উপরেই প্রধানত প্রতিহত হয়েছিল, তাঁর পরিচ্ছদের বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নি।

ভদ্রলোক যেখানে ব'সে ছিলেন, ঠিক তার উপরের বাঙ্কে একটি কলসি বস্ত্রাচ্ছাদিত অবস্থায় খড়ের বিঁড়ের উপর বসানো ছিল। বিশেষ লক্ষ্য ক'রে না দেখলে, কলসিটির স্বরূপ অপরের পক্ষে প্রণিধান করা সম্ভব ছিল না। বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ সতর্ক দৃষ্টিতে সেটির প্রতি চেয়ে দেখছিলেন। বারাসত থেকে গাড়ি ছেড়ে কিছুদূর আসতে না আসতে—আরে, গ্যাছে গ্যাছে, মশায়, হরুন হরুন।—ব'লে লাফ দিয়ে উঠে বৃদ্ধ সবেগে কলসির দিকে ধাবিত হলেন, এবং দুই হাতে কলসিটিকে চেপে ধ'রে ব'লে উঠলেন, এই হারছে, এই এই এই—যাঃ, এক্‌কালে গ্যাছেক গিয়া।

নিম্নস্থ ভদ্রলোক ব্যাপারের গুরুত্ব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করবার পূর্ব্বেই উপর হইতে শতধারে সুমিষ্ট খর্জ্জুরগুড় তাঁর সর্ব্বাঙ্গ প্লাবিত ক'রে দিল।

এঃ এঃ—একি, একি—উঃ!—ব'লে আর্ত্তনাদ ক'রে হস্তপদ বিস্তার করতে করতে সলম্ফে ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। শ্মশানে মৃত পুত্র দর্শনে মহারাজা হরিশ্চন্দ্রও বোধ হয় এত বিচলিত হন নি। তাঁর তৎকালীন বিকট মুখভঙ্গি ও অঙ্গসঞ্চালন দেখে গাড়িসুদ্ধ লোক হো-হো ক'রে হেসে উঠল।

অনতিদূরে জনৈক হিমাচলসদৃশ গম্ভীর প্রৌঢ় বসেছিলেন। তিনি মেঘমন্দ্রস্বরে বললেন, মশায়, হাত-পাগুলো একটু আস্তে নাড়বেন, সারা গায়ে যে ভাবে মেখেছেন তাতে আপনিই সবাইকে তাড়াবেন দেখছি।

একজন রসিক যুবক ব'লে উঠলেন, বাঃ, হয়েছে মন্দ নয়! এখন কিছু তুলো ছিটিয়ে দিলেই হয়!

আর এক ভদ্রলোক বললেন, কি বীভৎস ব্যাপার! হ্যাঁ মশাই, ও কোন্‌দেশী গুড় আপনার?

বৃদ্ধ এতক্ষণ হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। এইবার কিছু সামলে নিয়ে বললেন, হঃ, গুড্‌ডা কিছু তরলই আছিল, তাইতো বেবাকগুলিই নষ্ট হইল। গুর না আইন্যা চিনি আনলেই অইত। তহন ভাবছিলাম, গুরেই মিষ্টত্ব বেশি।

মুখ্য নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য অনুশোচনা সমাপ্ত ক'রে গৌন অপরাধের জন্য বৃদ্ধ ভদ্রলোকটির কাছে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছিলেন। ভদ্রলোকের মনে ও প্রাণে তখন চাণক্যের উক্তি পূর্ণমাত্রায় প্রভাব বিস্তার করেছিল, ক্ষমা নেই। পৃথিবীতে কেউ কাউকে ক্ষমা করে না, করতে পারে না। হৃদয়ের যে আগুন টগবগ ক'রে ফুটছে সে কি তোমার দুফোঁটা সখের চোখের জলে ঠাণ্ডা হয়? তা হয় না—ইত্যাদি।

বৃদ্ধ নিকটস্থ হবামাত্রই তিনি তাঁর মুখে এক ঘুষি বসিয়ে দিলেন। আমি হাত ধ'রে ফেলায় ঘুষিটি পূর্ণমাত্রায় লাগতে পারে নি, নচেৎ বৃদ্ধ ভূপতিত হতেন সন্দেহ নেই।

এই সময়ে দু তিনখানি বেঞ্চ অতিক্রম ক'রে এক বলিষ্ঠ যুবক—দেখছো না ব্যাডার কাণ্ড! বানরীপাড়ার সুধন্য ডিপুটির বাপরে মারছে ঘুষি!—বলতে বলতে ব্যাঘ্রের মত সলম্ফে ভদ্রলোকটির উপর পতিত হলেন। শিকল টেনে প্রাণ রক্ষা করব কিনা ভাবছি এই সময়ে দেখি বৃদ্ধ সবলে যুবকটিকে ধ'রে বলছেন, আরে, এইডা কর কি? থাম থাম।

ট্রেন শিয়ালদা ষ্টেশনে পৌছিবামাত্র দেখলাম আমাদের গাড়ির দরজায় এক দীর্ঘকায় সুঠাম বাঙালী সাহেব, সঙ্গে একটি সুসজ্জিতা সুন্দরী তরুণী। বৃদ্ধ জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললেন, সুধন্য, নিজেই আসছ? আরে, মনাও তো আসছে দেহি!

বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন। উভয়েই প্রণাম ক'রে বৃদ্ধের পায়ের ধূলো নিল।

তরুণী হাসতে হাসতে বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধ'রে বললে, দাদু, কি দেবে বল, আমি ইংরেজীতে অনার্স পেয়েছি।

বৃদ্ধ আনন্দে নাতনীকে দুই হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন।

পিছনে আরদালি দাঁড়িয়ে ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, উনি কে?

শুনলাম, ওয়ার্ড ষ্টেটের ডেপুটি কালেক্টার।

মরা নদী

মরা নদী। দুধার ঝোপজঙ্গলে ভ'রে উঠেছে। একহাঁটু জল, কোথায়ও বা কিছু বেশি। বর্ষায় ভ'রে উঠে বটে, কিন্তু শেওলায় ঢাকা, নৌকা-ডিঙি চলে না! বছরের ন মাস লোক হেঁটেই পার হয়, মাস তিনেকের জন্য একটা বাঁশের শাঁকো ক'রে রাখে। এই মরা নদীর কিনারায় এক সময়ে যে ঘন বসতি ছিল, উচু উচু ভিটাগুলি এখনও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

বুড়ো দিনের বেশির ভাগ সময়টা এই মরা নদীর ঘাটেই ব'সে থাকে, রাতেও সুযোগ পেলে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে আসে। ব'সে ব'সে ভাবে। কি ভাবে তা সেই-ই জানে। পথ-চলা লোক আসে যায়, বুড়ো ডেকে ডেকে আলাপ করে। কোন্ গাঁ থেকে আসছ বাপু? কোথায় যাবে? কতক্ষণে পৌছবে? খোলাহাটী? শ্বশুরবাড়ি? আহা, যাবে বই কি? এস, না গেলে কি চলে?

পথিকরা হাসে। কেউ বলে, পাগল। কেউ বলে, বড় ভাল লোক। বুড়োকে চেনে সবাই। দেশের মধ্যে অত বড় বুড়ো আর নেই। ছেলের নাতি এসে ডাকে, জ্যেঠা, সন্ধ্যে হয়ে গেল, চল। ছেলের নাতিনী এসে পিঠের উপর ঝাপিয়ে পড়ে, ক-খন যাবে?

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া যখন পৃথিবীর গায়ে ধীরে ধীরে একখানা কৃষ্ণ যবনিকা টেনে দিতে থাকে, ও পারের প্রকাণ্ড মাঠটার তিন দিক যখন

আঁধার হয়ে গাছপালাগুলো মিলিয়ে যায়, আকাশে যখন দু একটা ক'রে তারা ফুটে ওঠে তখন একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বুড়ো ছেলে-মেয়েদের হাত ধ'রে উঠে যায়। বছরের পর বছর, বহু বছর থেকে—শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই, মরা নদীর কূলে বুড়ো ব'সেই আসছে। কত চেনা মুখ আর দেখা যায় না। কত নাতি কত নাতিনী বড় হয়ে আর গল্প শুনতে আসে না।

মরা নদী, কত কালের মরা নদী। কি আছে এই প্রাণহীন অচঞ্চল শেওলা-ঢাকা জলে আর হিজিবিজি আগাছায় ভরা দুটি পাড়ে, যার সৌন্দর্য্য বছরের পর বছর ধ'রে দেখে দেখেও বুড়োর আশা মেটে না, তা সেই জানে। বুড়ো কিন্তু ভাবে, আছে, ওগো, আছে। আজ এর উচ্ছ্বাসভরা ছলছল স্রোতবেগ থেমে গেছে বটে কিন্তু তার অতীত গৌরবের স্মৃতিটুকু সে এখনও বুকে ধ'রে রেখেছে। সে খবর তো আর কেউ রাখে না। তার বুকের ওপর দিয়ে যে একদিন মিলন-প্রয়াসী প্রবাসী প্রিয়াকে নিয়ে ছোট ছোট নৌকাগুলি পাল তুলে তরতর ক'রে ছুটে চলেছে, তার কূলে দাঁড়িয়ে যে গ্রাম্যবধূরা সলাজ চোখে আকুল অগ্রহে চেয়ে থেকেছে বাঞ্ছিতের আসার আশায়, তার ঘাটে ঘাটে যে দুরন্ত, ছেলেরা জল ছিটিয়ে ঝাঁপাঝাঁপি করেছে তরুণ প্রাণের উদ্দাম আবেগে, কলসি কাঁখে সারি সারি মা মেয়েরা যে তারি ক্ষীর-ধারা ভ'রে নিতে এসেছে ঘরে ঘরে তৃষ্ণার শান্তি করতে, দেবতার ঘট পূর্ণ করতে, তা এক সেই জানে। তার কানে যে এখনও বাজছে ওপারে ওই সবুজ ধানের ক্ষেতের আলে ভাঙা আমগাছটার শিকড়ের ওপর ব'সে রাখাল ছেলে গাইছে—

তোমার বাড়ি আমার বাড়ি মধ্যে সূতী নদী
কেমন ক'রে যাই রে বঁধু পান্থা না দেয় বিধি।

আজ সে বুড়ো বটে। চামড়া ঝুলছে, মুখে ভাঁজে ভাঁজে রেখা পড়েছে, কিন্তু মনটি তো তার মোটেই বুড়ো হয় নি, স্মৃতিগুলো তো একটুও পুরোনো হয় নি। এই তো সে দিনের কথা, সেই সুপুষ্ট দেহে যৌবনের জয়টীকা! কোথায় গেল সে সম্পদ? এরি মধ্যে সে হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু সে শুধু বাইরের খোলস। স্মৃতি ভিতরটাকে এখনও তেমনই ঝকঝকে তকতকে তরুণ ক'রে রেখেছে—তেমনই সবুজ, তেমনই রঙিন। বুড়ো ভাবছে জোয়ারের অপেক্ষা করছি, জোয়ার এলেই সে আসবে।

উঃ, জান কি কেউ, কি স্বপ্নের তুলি দিয়ে আঁকা একখানা সুন্দর ছবি লুকিয়ে রেখেছে ওই মরা নদী তার বিগতযৌবন শুষ্ক আবর্জ্জনায় ঢাকা জর্জ্জরিত পাঁজরার ভিতরে! ও আমার ব্যথার ব্যথী, ও আমার চির সঙ্গী, ওর সঙ্গে এক সুরে আমার হৃদয়তন্ত্রী বেজে ওঠে। তাই নিরালায় ব'সে ভাষাহীন কথায় আমরা দুজনে নীরব প্রাণকে মুখরিত ক'রে রাখি। ও বলে, ও শুকিয়েছে আমার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে। না না, 'তা নয়। ও শুকিয়েছে তাই সে ফিরতে পারে নি। কবে আবার ও ঢেউ তুলবে? কবে আমার ঘরের লক্ষ্মী ফিরে আসবে?

দুজন লোক যাচ্ছিল। একজন বললে, বুড়োর বয়স মত জানিস?

কত?

একশো পার।

বুড়ো ভাবল, একশো বছর! সে আর কটা দিন! এই তো সেদিন আমার বাপ ছিল, মা ছিল আর একজন ছিল। ফুটফুটে চেহারা, এক মুখ হাসি, নীল দুটো চোখ তাতে কত লজ্জা, কত কৌতূহল, কত কথা, কত কল্পনা। সে এই ঘাটে জল নিতে আসত আমি আম পাড়বার ছল ক'রে ওই গাছের নীচে এসে দাঁড়াতাম, একটা চোরা চাউনির লোভে।

সে চাউনি অন্য সময়ে ঠিক তেমনই হ'ত না। বাবা মা জাগবার আগে সে ভোরে উঠে বকুলতলায় ফুল কুড়োতে আসত, চুরি ক'রে মালা গেঁথে আমায় দেবে ব'লে একদিন চুপি চুপি তার পিছনে এসে দাঁড়ালাম। হঠাৎ চমক লাগার সঙ্গে তার মুখখানি লাল হয়ে উঠল। সে যে আমার চোখের উপর ভাসছে, মনে হচ্ছে—সে যেন কাল।

তারপর একদিন সে বিদায় নিতে এল বাপের বাড়ি যাবে ব'লে, ফিরে এসে আমায় একটা ছোট খোকা উপহার দেবে ব'লে। সে বিদায়ে কত আনন্দ, কত বেদনা! আনন্দে ও বিরহে ভরা ভাসা ভাসা দুটো ছলছলে চোখ। ওগো, সে তো মোটেই পুরোনো হয় নি। ঘাটে নৌকা বাঁধা। আমার পায়ের উপর মাথাটি রেখে আশীর্ব্বাদ চাইলে, আবার ফিরে এসে আমার বুক আঁকড়ে থাকবে, আর সঙ্গে আসবে একটা সজীব খেলনা; চোখ দুটো আবার জলে ভ'রে উঠল। প্রাণ ভ'রে আশীর্ব্বাদ করলাম। কি আশীর্ব্বাদ করেছিলাম, ও গো কি আশীর্ব্বাদ করেছিলাম?

নৌকা ছেড়ে দিল। ঘোমটার মধ্য থেকে তার চোখ দুটো যেন শেষবার আমায় প্রাণভ'রে দেখে নিলে। উঃ, কি সে দৃষ্টি! ওই যে সেই স্বচ্ছ জলধারা তরতর ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে ছোট ছোট ঢেউয়ের সঙ্গে নেচে নেচে। ওই যে সেই পানাসখানি ভেসে চলেছে তাকে বুকে ক'রে। দূরে—দূরে—আরও দূরে মিলিয়ে গেল। চেয়ে রইলাম। আর দেখা যায় না। আবার তো আসবে। দুটি মাস বই'ত নয়, আবার আসবে। চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ঢেউগুলি খলখল ক'রে হেসে উঠল, কানে বড় বেসুরো বাজল। ওপারে চাইলাম, ধোঁয়া, সব ধোঁয়া। গাছগুলো যেন ব্রহ্মাণ্ডের বুকে চির-দিনের জন্য মিশে যাচ্ছিল। উপরে চাইলাম, মালাবদ্ধ বলাকাশ্রেণী

উড়ে যাচ্ছে যেন শেষদিনের ফিরে যাওয়া, কোন অনন্তের অন্তহীন কোলে।

সে চ'লে গেল। একটি দুটি দিন গুণি, আর এই নদীর ঘাটে ব'সে যেদিকে গিয়েছিল সে সেইদিকে চেয়ে থাকি। সেই চাওয়া চেয়েই আছি। একদিন দুদিন তিনদিন ক'রে দুমাস কেটে গেল। কি সে ব্যাকুলতা! ওই আসে, ওই আসে।

তারপর একদিন এল এক বুক-ভাঙা খবর। সে নাকি আর আসবে না। সে তার সবখানি কথা রাখতে পারল না। তবে আমায় একটা জীবন্ত পুতুল উপহার দেবে বলেছিল তা নাকি সে রেখে গিয়েছে? কিন্তু কাকে নিয়ে খেলব? পাষাণ হয়ে গেলাম। চোখে জল এল না, দুঃখে কথা বেরুল না! লোকে বলতে লাগল, বেচারা পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু পাগল হ'তে পেরেছি কই? পাগল কি সব কথা এত গুছিয়ে ভাবতে পারে?

ভেবে ভেবে স্থির করলাম, সব মিথ্যা কথা। বিশ্বাস হ'ল না যে সে আর আসবে না। আসবে, নিশ্চয়ই আসবে সে। তাই চেয়ে আছি ওই নদীর বাঁক পর্যান্ত এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। চেয়ে থাকতে থাকতে স্রোত থেমে গেল, নদী শুকিয়ে গেল, শেওলায় তার স্বচ্ছ জল ঢেকে গেল, পাড় দুটো তার জঙ্গলে ছেয়ে গেল। সে এল না। কেমন ক'রে আসবে সে? নৌকা ডিঙি তো আর চলে না! মরা নদী বেয়ে আমার ঘরের লক্ষ্মী বুঝি আর আসতে পারবে না। তবু আমার এই নদীর কিনারায় ব'সে থাকতে ভাল লাগে। মরা নদী যদি আবার বাঁচে তবেই তো সে আসতে পাবে। এতদিন পরে আসবে, আমায় না দেখে যদি ফিরে যায়?

একদিন নদীর ধারে ব'সে থাকতে থাকতে বুড়ো হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, না না, এমন ক'রে তো হবে না, নদীকে বাঁচাতেই হবে, নইলে সে আসবে কি ক'রে? দুর্ব্বল শীর্ণ হাত দুখানি তার থর থর ক'রে কেঁপে উঠল, অসমর্থ পা দুখানি তার নতুন হাঁটতে শেখা শিশুর মত দুলতে লাগল। ছুটে গেল সে। টলতে টলতে শেওলাগুলোকে টেনে তুলে জঙ্গলগুলোকে কেটে ছিঁড়ে নদীটাকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্যে। প্রাণটা তার ডুকরে কেঁদে উঠল, ওগো, কেউ কি দরদী নেই, আমার মত যার ঘরের লক্ষ্মী আসবার পথ পাচ্ছে না? ওগো সবল, ওগো তরুণ, কেউ কি আসবে না তোমরা, এই মরা নদীটাকে বাঁচিয়ে দিতে? তা হ'লে তাকে আমি ফিরে পেয়ে দুহাতে বুকে জড়িয়ে ধরি, দীর্ঘ জীবনের সঞ্চিত পরিপূর্ণ যৌবনের অনন্ত ভালবাসা নিয়ে।

ড়োর ডাকে কেউ সাড়া দিল না। বুড়োর কণ্ঠও চিরদিনের মত নীরব হয়ে গেল। তার জীর্ণ দেহটা মরা নদীর কিনারায় একটা ঝোপের ওপর লুটিয়ে পড়ল, ঠিক যেখানে একদিন দাঁড়িয়ে থেকে সে তার বাঞ্ছিতাকে বিদায় দিয়েছিল।